টুকরো কথা

জীবজগতের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্ক

বহু অণুজীব মৃত, পচাগলা বস্তুর ওপর নিজদেহ থেকে উৎসেচক ক্ষরণ করে ওই উৎসেচকের ক্রিয়ায় জটিল খাদ্যবস্তুকে ভেঙে দেয়। ফলে নানা শোষণযোগ্য ও ব্যবহারযোগ্য উপাদান তৈরি হয়। বহু ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাক এই পদ্ধতিতে পুষ্টিকার্য সম্পন্ন করে। এখানে একই সঙ্গে জটিল জৈববস্তু বিয়োজন ও রূপান্তর ঘটে। এই পদ্ধতিই হলো মৃতজীবিতা (Saprophytism)। এর ফলে পরিবেশ দূষণমুক্ত হয়, জীবাণুর সংক্রমণ ঘটার সম্ভাবনা কমে ও মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায়।

পরিবেশে অণুজীবের ভূমিকা (কৃষি, খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ, ওষুধ প্রস্তুতি, বর্জ্য পরিষ্কার)

কৃষি

অণুজীবরা মানুষসহ অন্যান্য জীবদেহে যে যে অপকারী ভূমিকা পালন করে তার একটি তালিকা তৈরি করো। তবে অপকারই নয়, নানা ক্ষেত্রে এরা উপকারী ভূমিকাও পালন করে। এসো কৃষিকাজে ঘটে চলা কতকগুলি ঘটনার সঙ্গে আমরা পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করি।

ঘটনা	সমস্যা
1. বিভিন্ন চাষ করা ফসলের দেহ গঠনের প্রধান উপাদান হলো প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিড। এগুলো নাইট্রোজেন ছাড়া তৈরি করা যায় না। কিন্তু কোনো উদ্ভিদই বাতাসের নাইট্রোজেন সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না।	কীভাবে বাতাসের নাইট্রোজেন উদ্ভিদের ব্যবহারযোগ্য নাইট্রোজেনে পরিণত হতে পারে?
2. পাটগাছ বড়ো হয়ে গেলে তাকে কেটে ডোবা বা পুকুরের অপরিষ্কার জলে কিছুদিন ডুবিয়ে রাখা হয়।	কীভাবে পাটের তন্তু পাটের কাণ্ড থেকে আলাদা করা সম্ভব?

● অধিকাংশ উদ্ভিদই নাইট্রোজেনকে নাইট্রেট NO^{-}_{3} বা অ্যামোনিয়াম NH^{+}_{4} রূপে ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু মাটিতে এদের পরিমাণ খুবই কম এবং এরা সহজেই মাটি থেকে ধুয়ে চলে যায় বা অন্যভাবে নষ্ট হয়ে যায়।

অণুজীবরা নানাভাবে মাটিতে সরাসরি বাতাসের নাইট্রোজেন যুক্ত করে বা নাইট্রোজেনযুক্ত ব্যবহার উপযোগী যৌগ তৈরি করে মাটিতে মিশিয়ে দেয়—

(i) ক্লসট্রিডিয়াম, অ্যাজোটোব্যাকটার জাতীয় স্বাধীনজীবী ব্যাকটেরিয়া ও নানা সায়ানোব্যাকটেরিয়া সরাসরি বাতাসের নাইট্রোজেনকে শোষণ করে নিজেদের দেহে নাইট্রোজেন যৌগ গঠন করে। এসব অণুজীব মরে গেলে ওই নাইট্রোজেন যৌগগুলো মাটিতে মুক্ত হয়।

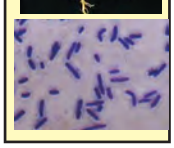

(ii) ডাল, সয়াবিন জাতীয় উদ্ভিদের মূলের অর্বুদে বসবাসকারী মিথোজীবী ব্যাকটেরিয়া রাইজোবিয়াম নাইট্রোজেন স্থিতিকরণে (Nitrogen Fixation) সমর্থ। এরা নাইট্রোজেনকে নাইট্রোজেন যৌগে পরিণত করে। এর কিছুটা অংশ আশ্রয়দাতা উদ্ভিদকে সরবরাহ করে। বাকিটা অর্বুদ পচে গেলে মাটিতে মিশে যায়।

(iii) উদ্ভিদ বা প্রাণীরা যখন মারা যায়, তখন তাদের দেহের নানা নাইট্রোজেনযুক্ত যৌগ ভেঙে গিয়ে অ্যামোনিয়া তৈরি হয়। এই পদ্ধতিকে অ্যামোনিফিকেশন (Ammonification) বলে। নাইট্রোসোমোনাস, নাইট্রোব্যাকটার নামক নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া অ্যামোনিয়ামকে যথাক্রমে নাইট্রাইট ও নাইট্রেটে রূপান্তরিত করে। এই পদ্ধতিকে নাইট্রিফিকেশন বলে।

- পাট গাছকে কয়েকদিন পুকুর বা ডোবার অপরিষ্কার জলে চুবিয়ে রাখলে জলের ব্যাকটেরিয়া পাটের কাণ্ডে থাকা পেকটিন নষ্ট করে দেয়। ফলে পাটের তন্তুগুলো পাটকাঠি থেকে সহজেই আলাদা করা সম্ভব হয়।

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ

(i) দই তৈরি — যখন দই-এর মধ্যে থাকা ল্যাকটোব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া 37^0C উষ্ণতায় গরম দুধের সঙ্গে মেশানো হয় তখন তাদের সংখ্যা খুব তাড়াতাড়ি বাড়তে থাকে। এই ব্যাকটেরিয়া দুধের ল্যাকটোজকে ল্যাকটিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত করে।

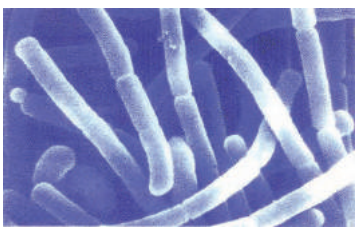

ল্যাকটোব্যাসিলাস

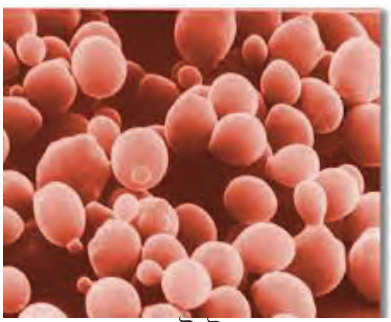

ইস্ট

(ii) বিশেষ বিশেষ ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়ার ক্রিয়ায় চিজ, কেক, ধোকলা, ইডলি, দোসা, পাঁউরুটির মতো নানা খাবার বানানো যায়।

(iii) ইস্টের কোশ ফলের রসে থাকা শর্করাকে ভেঙে অ্যালকোহল তৈরি করে। ব্যাকটেরিয়া এই অ্যালকোহলকে ভিনিগারে রূপান্তরিত করে।

টুকরো কথা

খাওয়ার পর তোমরা কি কেউ কখনও অসুস্থ হয়েছ? যদি কেউ খাদ্য খাওয়ার পর অসুস্থ হন, তবে বুঝতে হবে খাদ্যে কোনো অণুজীবের সংক্রমণ ঘটে থাকতে পারে। সাধারণত ছত্রাক আর ব্যাকটেরিয়া খাদ্যের সংস্পর্শে এলে খাদ্যস্থিত নানা যৌগকে ভেঙে ফেলে। আর অণুজীবদের দেহ থেকে বেরোনো বিষাক্ত পদার্থ খাদ্যের সঙ্গে মিশে খাদ্যকে ব্যবহারের অনুপযোগী করে তোলে।

কীভাবে খাদ্যকে ভালো রাখা সম্ভব?

- কোনো পাত্রে বায়ুশূন্য করে খাদ্যকে রেখে (Canning) বা বিশেষ মোড়কে রেখে (Packaging)
- কোনো কোনো সবজি (যেমন- বাঁধাকপি) ও ফলকে (যেমন- টুকরো বা কাটা আম) দীর্ঘসময় রোদে শুকিয়ে নিয়ে (Sun drying)
- মাছ, মাংস বা ফলে নুন মাখিয়ে রাখলে (Salting)
- কাটা আম, লেবু, বাঁধাকপি, পিঁয়াজে ভিনিগার যোগ করলে (Pickling)
- ফলে চিনি যোগ করে (Adding Sugar)
- খাদ্যকে কম তাপমাত্রায় রেখে (Refrigeration)
- পাস্তুরাইজেশন (Pasteurization)

ওষুধ প্রস্তুতি

বিশেষ কিছু ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের দেহনিঃসৃত কিছু কিছু জৈব যৌগ অন্যান্য ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধিতে বাধা দেয় অথবা তাদের মেরেও ফেলে। এইসব যৌগকে নানাভাবে বিশুদ্ধিকরণের ও প্রয়োজনে রাসায়নিকভাবে পরিবর্তনের মাধ্যমে নানান জীবনদায়ী ওষুধ তৈরি করা হয়। এই জীবনদায়ী ওষুধগুলোকে অ্যান্টিবায়োটিক (antibiotic) বলা হয়।

টুকরো কথা

আলেকজান্ডার ফ্লেমিং 1928 সালে প্রথম অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি অ্যাগার (agar) প্লেটে ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি দেখছিলেন। কিন্তু একটা প্লেট তিনি অসাবধানতাবশত খোলা রেখেছিলেন। প্লেটের ওপরে একটা ছত্রাক ক্রমশ সংখ্যায় বাড়তে লাগল এবং ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি ব্যাহত হলো। এই ছত্রাকটি ছিল পেনিসিলিয়াম নোটেটাম। এই ছত্রাকের দেহ থেকে পাওয়া যৌগটি ছিল পেনিসিলিন। যা ছিল মানুষের আবিষ্কৃত প্রথম অ্যান্টিবায়োটিক।

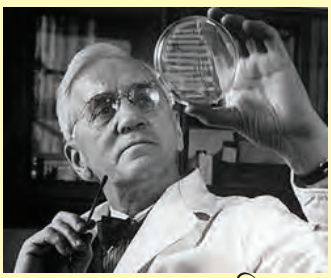

আলেকজান্ডার ফ্লেমিং

এরপর স্ট্রেপটোমাইসিন, ক্লোরোমাইসেটিন, অ্যাম্পিসিলিনের মতো নানা অ্যান্টিবায়োটিক মানুষ আবিষ্কার করেছে। এইসব অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ঠেকানো যায়। ভাইরাস বা ছত্রাকঘটিত কোনো রোগে এরা কাজ করে না।

ভ্যাকসিন — যখন কোনো জীবাণু (ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া বা ছত্রাক) আমাদের দেহে প্রবেশ করে, তখন জীবাণুর গাত্র বা দেহ থেকে বেরোনো নানা ক্ষতিকারক যৌগ আমাদের দেহে প্রবেশ করে। এরা হলো অ্যান্টিজেন। এদের ধ্বংস করার জন্য আমাদের শরীরে একধরনের যৌগ তৈরি হয়। এরা অ্যান্টিজেনকে আক্রমণ করে ও ধ্বংস করে। এই প্রোটিনধর্মী যৌগগুলি হলো অ্যান্টিবডি। কোনো জীবদেহের রোগ প্রতিরোধের স্বাভাবিক এই ক্ষমতাই হলো অনাক্রম্যতা বা ইমিউনিটি (Immunity)।

এখন কোনো মৃত, দুর্বল, জীবিত অণুজীবকে বা সরাসরি অণুজীবের দেহ থেকে বেরোনো দুর্বল বিষকে নির্দিষ্ট ডোজে আগে থেকে কোনো মানুষের দেহে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হলে কী হতে পারে? ওই ধরনের অণুজীবদের বিরুদ্ধে আগে থেকেই রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই পদ্ধতিকে বলা হয় টীকাকরণ বা অনাক্রম্যকরণ (Vaccination বা Immunization)। ভ্যাকসিন ব্যবহার করে টাইফয়েড, টিটেনাস, পোলিও, ডিপথেরিয়ার মতো বহু রোগকে ঠেকানো সম্ভব হয়েছে।

বর্জ্য পরিষ্কার

(i) মল বা মূত্রের মতো অশোধিত বর্জ্য মানব স্বাস্থ্যের পক্ষে এক বিশেষ ঝুঁকি। কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়া কম অক্সিজেনযুক্ত পরিবেশে থাকে। এরা এধরনের বর্জ্যকে ভেঙে নানা ব্যবহারযোগ্য যৌগ তৈরি করে। এরা রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা কমায়। আবার মাটির উর্বরতাও বাড়ায়।

(ii) ভারত বা চিনের মতো দেশে গ্রামের দিকে মানুষ ও অন্য জন্তুর মল, তরকারির খোসার মতো বর্জ্যকে মেথানোজেনিক ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে ভেঙে মিথেন গ্যাস তৈরি করা হয়। এই গ্যাস কয়লা, কেরোসিনের মতো জ্বালানির বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

(iii) মহাকাশযানে বাতাস পরিষ্কার করতে কোনো কোনো শ্যাওলাকে ব্যবহার করা হয়।

ফসল, ফসলের বৈচিত্র্য ও ফসল উৎপাদন

কৃষিবিজ্ঞান

আমরা নানারকম খাবার খাই। তার কোনোটা আমরা পাই উদ্ভিদ থেকে আবার কোনোটা পাই প্রাণীদের থেকে। উন্নতমানের উদ্ভিদজাত আর প্রাণীজাত খাবার যথেষ্ট পরিমাণে পেতে গেলে কিছু বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। তার জন্য বিজ্ঞানের একটা শাখায় খাদ্য উৎপাদনের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। বিজ্ঞানের এই শাখাটাকেই আমরা বলি কৃষিবিজ্ঞান (Agriculture)। নতুন আর উন্নত ধরনের শস্য বা ফসল উৎপাদনের পদ্ধতির আবিষ্কার, বেশি দুধ আর উন্নত মানের ডিম বা ক্ষেত্রবিশেষে মাংস পাওয়ার জন্য বিভিন্ন পশু-পাখি (যেমন গোরু, ছাগল, ভেড়া আর মুরগি ইত্যাদি) পালন করার পদ্ধতি— এসব নিয়েই কৃষিবিজ্ঞানে আলোচনা করা হয়।

কৃষিবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়

1. মাটির ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ মাটিকে ফসল ফলানোর উপযোগী করে তোলা(Soil management)
2. ফসল উৎপাদন (Crop production)
3. ফল, সবজি, ফুল আর সাজানোর কাজে লাগে এমন বিভিন্ন উদ্ভিদের চাষ (Horticulture)
4. পশুপালন (Animal husbandry)

ফসল কী?

বড়ো মাপে কোনো উদ্ভিদের চাষ করার সময় সেই উদ্ভিদের চাহিদার দিকে বিশেষভাবে নজর রাখা হয়, যাতে ওই উদ্ভিদের ফলন বাড়ে। এইভাবে অনেকটা জায়গা জুড়ে একই ধরনের উদ্ভিদের চাষ যখন করা হয়, তখন ওই উদ্ভিদদের একসঙ্গে বলা হয় শস্য বা ফসল (Crop)।

ফসলের বৈচিত্র্য

ফসল বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। নীচের তালিকায় বিভিন্ন ধরনের ফসলের কথা বলা হলো। তোমার জানা আরো কিছু ফসলের নাম সারণিতে যোগ করতে পারো।

ফসলের ধরন	উদাহরণ
1. তণ্ডুল জাতীয় ফসল	ধান, গম, ...
2. তন্তু জাতীয় ফসল	তুলো, পাট, ...
3. ডালজাতীয় ফসল	ছোলা, মটর, বিন, ...
4. তৈলবীজ পাওয়া যায় এমন ফসল	সরষে, সূর্যমুখী, ...
5. কন্দ জাতীয় ফসল	আলু, আদা, ...
6. চিনি পাওয়া যায় এমন ফসল	আখ,.....
7. বাগানে চাষ করা হয় এমন ফসল	চা, কফি, রবার, ...
8. ওষুধ পাওয়া যায় এমন গাছ	তুলসী, ...
9. মশলা পাওয়া যায় এমন গাছ	গোলমরিচ, আদা, ...

তোমরা কি লক্ষ করেছ যে এমন কিছু খাবার আছে যা আমরা প্রতিদিন খাই অথচ সেগুলো ওপরের তালিকায় নেই? কী বলোতো? সবজি আর ফলকে ওই তালিকায় রাখা হয়নি। কারণ কৃষিবিজ্ঞানেরই আরেক শাখা উদ্যানবিজ্ঞান (Horticulture)-এ ফল আর সবজি চাষের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। নীচের তালিকায় এই ধরনের ফসলের নাম দেওয়া আছে । তোমরাও তার সঙ্গে আরো কিছু নাম যোগ করতে পারো।

ফসলের ধরন	উদাহরণ
1. সবজি	টম্যাটো, বাঁধাকপি, ...
2. ফল	কলা, আঙুর, ...
3. আলংকারিক উদ্ভিদ	ক্যাকটাস, বোগেনভেলিয়া, ...
4. ফুল	গোলাপ, জুঁই, ...

অনেকসময় আবার এমনও হয়, একটা ফসল কোনো বিশেষ ঋতুতে খুব ভালো হয়। অর্থাৎ ওই বিশেষ ঋতুর তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত, ওই ফসলের বেড়ে ওঠার জন্য উপযোগী। কোন ঋতুতে হয় তার ওপর নির্ভর করে ফসলকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়।

i) খারিফ ফসল

সাধারণত বর্ষার শুরুতে (জুন/জুলাই) এই ধরনের ফসলের চাষ শুরু হয়। আর সাধারণত বর্ষার শেষে (সেপ্টেম্বর/ অক্টোবর) এই ফসল তোলা হয়। খারিফ ফসলের ফলন নির্ভর করে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর ওপর। ধান, ভুট্টা, তুলো, চিনেবাদাম, সয়াবিন— এরা হলো কয়েকটা খারিফ ফসল।

ii) রবি ফসল

সাধারণত শীতের শুরুতে (অক্টোবর/নভেম্বর) এই ধরনের ফসলের চাষ শুরু হয়। আর মার্চ/এপ্রিল মাসে ফসল তোলা হয়। রবি ফসল বর্ষার ওপর নির্ভরশীল নয়। গম, বার্লি, ছোলা, মটর, সরষে — এরা হলো কয়েকটা রবি ফসল।

ফসল উৎপাদন

ফসল উৎপাদনের জন্য একজন কৃষক বা চাষিকে বেশ কিছুটা সময় জুড়ে নানারকম কাজ করে যেতে হয়। একজন কৃষক এই যে কাজগুলো করেন, এটাই হলো কৃষিকাজ (Agricultural practices)। এই কাজগুলো নীচে দেওয়া হলো। আমরা একে একে এইসব কাজগুলো সম্বন্ধে এরপর জানব।

1. চাষের জমির মাটি তৈরি করা	**5. আগাছা দমন**
2. বীজ বপন করা / বীজ বোনা	**6. ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ থেকে ফসলকে বাঁচানো**
3. সার প্রয়োগ	**7. ফসল তোলা**
4. জলসেচ	**8. ফসল সঞ্চয় করে রাখা**

1. চাষের জমির মাটি তৈরি করা (Preparation of soil of cultivable land)

বীজের অঙ্কুরোদগম আর উদ্ভিদের বেড়ে ওঠার মাধ্যম হলো মাটি। উদ্ভিদেরা জল আর নানান খনিজ মৌল পায় মাটি থেকে। বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদের বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন ধরনের মাটি। তাই কোনো ফসলের চাষ শুরু করার আগে মাটিকে চাষের উপযোগী করে তোলা খুবই জরুরি। চাষের জমির মাটিকে তাই ওপর-নীচ করা হয়। এর ফলে উদ্ভিদের মূল সহজেই মাটির গভীরে যেতে পারে।

মাটিতে থাকে বিভিন্ন খনিজ পদার্থ, জল, বায়ু, পচা-গলা জৈব বস্তু আর বিভিন্ন জীব। মাটি আলগা করলে, মাটিতে বায়ু চলাচল হলে তা কেঁচো আর মাটিতে বাস করা জীবাণুদের বেড়ে ওঠার পক্ষে সহায়ক হয়। ওইসব জীবেরা যে মাটিকে শুধু আরও আলগা করতে সাহায্য করে তাই নয়, এরা মাটির জৈব অংশ যা হিউমাস বাড়াতেও সাহায্য করে। এইসব জীবেরা কৃষকের বন্ধুর মতোই কাজ করে। মাটিতে বাস করা কিছু জীবাণু মৃত উদ্ভিদ বা প্রাণীদের দেহকে পচিয়ে ওইসব জীবের দেহের নানা যৌগ আর মৌলগুলোকে মাটিতে মিশিয়ে দেয়। এগুলোই উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান (nutrients), যা উদ্ভিদেরা মাটি থেকে গ্রহণ করে। মাটির ওপরের দিকের মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার পুরু স্তরটাই উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। তাই নীচের মাটি ওপরে আনলে বা ওপরের মাটি নীচে পাঠালে আর মাটি আলগা করে দিলে উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানগুলো মাটির ওপরের দিকে চলে আসে। ফলে উদ্ভিদেরা ওই যৌগ আর মৌলগুলোকে সহজেই নিজেদের কাজে লাগাতে পারে।

ভূমি কর্ষণের যন্ত্রপাতি

তোমরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে চাষের জমির মাটি ওপর-নীচ করা আর মাটি আলগা করার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছ। যে পদ্ধতিতে চাষের জমির মাটিকে ওপর-নীচ আর আলগা করা হয় তার নাম জানো কি? সহজ কথায় জমি চষা আর ভালো বাংলায় বললে ভূমিকর্ষণ করা। জমি চষতে লাগে লাঙল। এসো এবারে চাষের কাজে লাগে এমন কিছু যন্ত্রপাতির কথা জেনে নিই।

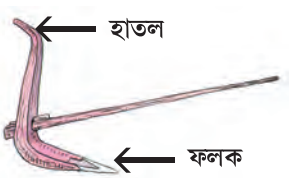

লাঙল

লাঙল (Plough)

বহু প্রাচীনকাল থেকেই চাষের কাজে লাঙলের ব্যবহার আছে। জমি চষা, মাটিতে সার মেশানো বা মাটি থেকে আগাছা তুলে ফেলার মতো নানান কাজে লাঙল ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে দেশি কাঠের তৈরি লাঙলের জায়গা নিয়ে নিচ্ছে লোহার তৈরি লাঙল।

নিড়ানি

নিড়ানি (Hoe)

নিড়ানির সাহায্যে চাষের জমি থেকে আগাছা তুলে ফেলা আর মাটি আলগা করার কাজ করা হয়।

কর্ষক (Cultivator)

বর্তমানে বড়ো বড়ো চাষের জমি কর্ষণ করতে ট্রাক্টরের সাহায্য নেওয়া হয়। ট্রাক্টরের পেছনে লাগানো কর্ষকের সাহায্যে খুব অল্প সময়েই অনেকটা জমি চষে ফেলা যায়। ছোটো জমি বা ফুলের বাগানে এখন অনেকসময় এই কাজে পাওয়ার টিলার ব্যবহার করা হয়।

ট্রাক্টর ও কর্ষক

এরপর একটা কাঠ বা লোহার তৈরি যন্ত্রের (Leveller) সাহায্যে চাষের উঁচু-নীচু জমিকে সমান করে নেওয়া হয়। এর ফলে জল বা বায়ুর প্রভাবে মাটির ক্ষয় কম হয়। অনেকসময় জমি চষার আগে মাটিতে জৈব সার মেশানো হয়। এর ফলে মাটির সঙ্গে সার ভালোভাবে মিশে যেতে পারে।

2. বীজ বপন/ বীজ বোনা (Sowing of Seeds)

বীজ বপন বা বীজ বোনা হলো চাষের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। বীজ বপনের আগে দেখে নেওয়া দরকার বীজগুলো ভালো গুণের অধিকারী অর্থাৎ বীজগুলো সুস্থ, খরা ও অতিবৃষ্টি -সহনক্ষম আর সংক্রমণ-মুক্ত কিনা। বেশি ফলন দেবে এমন বীজই চাষিরা পছন্দ করেন।

ভালো, সুস্থ বীজ আর খারাপ বীজ চিনবে কী করে? এসো একটা ছোটো পরীক্ষা করে দেখি। একটা গ্লাস বা বিকারে জল অর্ধেক ভরতি করো। একমুঠো গমের বীজ নিয়ে জলে ফেলে ভালো করে নাড়ো। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো। কী দেখতে পেলে নীচের সারণিতে লেখো।

কী করলে	কী দেখলে	কেন এমন হলো

সংক্রমণ বা অন্যান্য কারণে নষ্ট হয়ে যাওয়া বীজের ভেতরটা ফাঁপা। তাই নষ্ট হয়ে যাওয়া বীজগুলো হালকা বলে জলে ভেসে থাকে। আর ভালো, সুস্থ বীজগুলো ভারী হওয়ার জন্য জলে ডুবে যায়।

বীজ বপনের যন্ত্রপাতি

ছবিতে ফানেল আকৃতির একটা জিনিস নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ। ফানেলের নীচে তীক্ষ্ণ প্রান্তযুক্ত দুটো বা তিনটে পাইপ লাগানো থাকে। বীজগুলোকে ওই ফানেলে ভরা হয়। পাইপের তীক্ষ্ণ প্রান্ত মাটি ভেদ করে। আর ফানেল থেকে পাইপ বেয়ে বীজগুলো মাটির নীচে গিয়ে পড়ে। অনেক সময় চাষিরা লাঙলের সঙ্গেই বীজ বোনার উপযোগী এই ফানেল আর নল যোগ করে, লাঙল দিয়ে চষার ফলে তৈরি খাতে (Furrow) বীজ বোনেন।

বীজ বপন যন্ত্র (Seed Drill)

এখনকার দিনে অবশ্য জমিতে বীজ বোনার জন্য উন্নত বীজ বপন যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এর সাহায্যে সঠিক দূরত্ব এবং গভীরতায় বীজ বোনা সম্ভব। বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে বীজ বোনা হলে বীজগুলো সবসময়ই মাটি দিয়ে ঢাকা থাকে। ফলে পাখিরাও আর ওই বীজের নাগাল পায় না। সময় ও শ্রমের সাশ্রয় হয়।

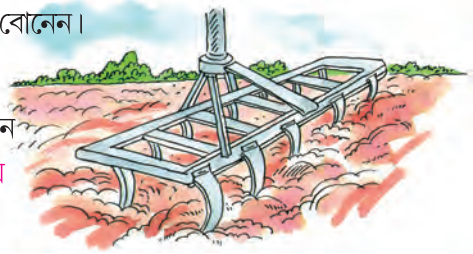

বীজ বপন যন্ত্র

অনেক সময় বীজ বোনার আগে চাষিরা বীজগুলোকে কোনো কোনো রাসায়নিকে ডুবিয়ে নেন। ওই রাসায়নিক পদার্থগুলো বীজগুলোকে জীবাণু সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচায়। ধান বা কিছু সবজির (টম্যাটো, পিঁয়াজ) বীজ প্রথমে বীজতলায় বোনা হয় । এরপর বীজতলায় চারাগাছগুলো কিছুটা বড়ো হলে, তাদের মধ্যে থেকে সুস্থ, সবল আর নীরোগ চারাগাছ বেছে নিয়ে চাষের জমিতে লাগানো হয়। ফলে উন্নত মানের চারাগাছ বেছে নেওয়া সম্ভব হয়। প্রতিস্থাপিত চারাগাছগুলোও মাটির গভীরে মূল প্রবেশ করাতে সক্ষম হয়। ফলে ফলনও বাড়ে।

3. সার প্রয়োগ (Adding manures and fertilizers)

উদ্ভিদের ঠিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন হয় কিছু মৌলের — এরাই হলো উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান (nutrients)। উদ্ভিদের এই পুষ্টি উপাদানগুলো আবার দু-ধরনের হয়।

a) মুখ্য খাদ্য উপাদান (Macronutrients) : C, H, O, N, P, K, Mg, S।

b) গৌণ খাদ্য উপাদান (Micronutrients) : Fe, Mn, Cu, B, Mo, Zn, Cl।

এইসব পুষ্টি উপাদানগুলোকে মৌল হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও এগুলো আসলে যৌগ হিসাবে উদ্ভিদদেহে গৃহীত হয়। মাটি উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানগুলো সরবরাহ করে। উদ্ভিদের বেড়ে ওঠার জন্য এই পুষ্টি উপাদানগুলো খুবই জরুরি। কোনো কোনো অঞ্চলে চাষিরা হয়তো একই জমিতে একটার পরে একটা ফসল ফলিয়ে যান বা একই ফসল বারবার চাষ করেন। জমি কখনই অনাবাদী হিসেবে ফেলে রাখেন না। ভেবে দেখোতো তাহলে মাটিতে থাকা উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানগুলোর কী অবস্থা হবে?

একই জমিতে বারবার ফসল ফলানো হলে মাটিতে থাকা উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানগুলো ফুরিয়ে আসে। তাই চাষের জমিতে সার মেশাতে হয়। যাতে মাটি উদ্ভিদের হারিয়ে যাওয়া পুষ্টি উপাদানগুলো আবার ফিরে পায়। অর্থাৎ মাটিতে থাকা উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি পুষিয়ে দিয়ে উদ্ভিদের বৃদ্ধির সহায়ক হয় যেসব পদার্থ, তারাই হলো সার। এই সার আবার দু-রকমের হয়। জৈব সার আর অজৈব সার ।

জৈব সার (Organic manure)

মৃত উদ্ভিদ আর প্রাণীদের বর্জ্য পচিয়ে তৈরি হয় জৈব সার। চাষিরা খোলা জায়গায় একটা গর্ত খুঁড়ে সেখানে মৃত উদ্ভিদ আর প্রাণীদের বর্জ্য পদার্থ ফেলে রাখেন পচে যাওয়ার জন্য। ব্যাকটেরিয়া আর ছত্রাকের বিয়োজন ও রূপান্তর ক্রিয়ায় ওইসব বর্জ্য পদার্থগুলো পচে গিয়ে তৈরি হয় জৈব সার।

অজৈব সার (Inorganic fertilizer)

অজৈব সার হলো একধরনের রাসায়নিক পদার্থ। এতে থাকে নানা অজৈব লবণ, যা উদ্ভিদের বৃদ্ধির সহায়ক। সার কারখানায় তৈরি হয় অজৈব সার। অজৈব সার প্রধানত তিন ধরনের মৌলের ঘাটতি পূরণ করে— নাইট্রোজেন (N), ফসফরাস (P) আর পটাশিয়াম (K)। NPK সারে এই তিনটি প্রধান উপাদান বিভিন্ন মাত্রায় মেশানো থাকে। আবার কখনও বা কোনো অজৈব সারে এই তিনটি উপাদানের যে-কোনো একটা উপাদান উপস্থিত থাকে। যেমন পটাস সার বা সুপার ফসফেট। আরও কয়েকটা অজৈব সার হলো ইউরিয়া, অ্যামোনিয়াম সালফেট।

নিজে করো

ছোলা, মুগ বা অন্য যে-কোনো তিনটে একই উচ্চতার একই ধরনের চারাগাছ নাও। তিনটে ফাঁকা গ্লাস নাও। গ্লাসগুলোতে 1, 2, 3 নম্বর দাও। 1 নং গ্লাসে অল্প একটু ইউরিয়া মেশানো মাটি নাও। 2 নং গ্লাসে অল্প একটু গোবর সার মেশানো মাটি নাও। খেয়াল রেখো যাতে 1 আর 2 নং গ্লাসে নেওয়া মাটির পরিমাণ একই হয়। 3 নং গ্লাসে একই পরিমাণ মাটি নাও। এই মাটিতে কিছু মিশিও না। তিনটে গ্লাসের মাটি একই জায়গা থেকে নিও। তিনটে গ্লাসে সমপরিমাণ জল দাও। এবারে তিনটে চারাগাছ তিনটে গ্লাসে বসিয়ে দাও। প্রতিদিন নিয়ম করে গ্লাসগুলোতে পরিমাণ মতো জল দাও। 7 - 10 দিন ধরে তিনটে গ্লাসে চারাগাছের বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করো।

কী দেখলে নীচের সারণিতে লেখো।

দিন	1ম গ্লাস	2য় গ্লাস	3য় গ্লাস	মন্তব্য

10 দিন পরে

1. চারাগাছের বৃদ্ধি সব গ্লাসে কি একই হারে হয়েছে?
2. কোন গ্লাসে চারাগাছের বৃদ্ধি সবচেয়ে ভালো হয়েছে?
3. কোন গ্লাসে চারাগাছের বৃদ্ধি সবচেয়ে তাড়াতাড়ি হয়েছে? এরকম হওয়ার পেছনে কী কারণ আছে বলে তোমার মনে হয়।

অজৈব সার ব্যবহারের সমস্যা

অজৈব সারের ব্যবহার, চাষিদের বিভিন্ন ফসল যেমন ধান, গম আর ভুট্টার খুব ভালো ফলন পেতে সাহায্য করে। কিন্তু অজৈব সারের অত্যধিক আর অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার মাটিতে থাকা উপকারী ব্যাকটেরিয়ার কাজে বাধা সৃষ্টি করে মাটির উর্বরাশক্তি বা উৎপাদন ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। মাটির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী অজৈব সার ব্যবহার না করলে মাটির রসায়ন পালটে গিয়ে ভালোর চেয়ে ক্ষতিই বেশি হয়। যেমন-— অ্যামোনিয়াম সালফেট $[(NH_4)_2 SO_4]$ ব্যবহার করলে যেমন মাটির আম্লিক ভাব বেড়ে যায়, তেমনি সোডিয়াম নাইট্রেট ($NaNO_3$) ব্যবহারে মাটির ক্ষারকীয়তাও বেড়ে যেতে পারে। উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য মাটির অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্য বজায় থাকাটা খুবই জরুরি। তাছাড়াও অজৈব সার ব্যবহার করা হয়েছে এমন চাষের জমি থেকে নাইট্রোজেন বা ফসফরাসের যৌগমিশ্রিত জল নদী বা পুকুরের জলে মিশে জলদূষণ ঘটায়। মাটির উর্বরাশক্তি বজায় রাখতে তাই বর্তমানে অজৈব সারের পরিবর্তে জৈব সার ব্যবহারের চেষ্টা করা হচ্ছে।

জৈব সার কেন অজৈব সারের চেয়ে ভালো?

i) জৈব সার মাটির জলধারণ ক্ষমতা বাড়ায়।

ii) জৈব সার ব্যবহার করলে মাটি রন্ধ্রযুক্ত হয়। ফলে মাটির মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন গ্যাসের আদান-প্রদান ভালো হয়।

iii) মাটিতে থাকা উপকারী জীবাণুদের সংখ্যা বাড়াতে সাহায্য করে জৈব সার।

iv) জৈব সার মাটির গঠন উন্নত করতে সাহায্য করে ।

এবারে তাহলে চট করে অজৈব সার আর জৈব সারে কী পার্থক্য লিখে ফেলার চেষ্টা করো ।

বাইরে থেকে সার ব্যবহার না করে মাটি থেকে হারিয়ে যাওয়া উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান প্রাকৃতিক কী কী উপায়ে আবার ফিরিয়ে আনা যায় এবারে দেখে নেওয়া যাক ।

a) চাষের জমি অনাবাদী ফেলে রাখা

দুটো ফসল চাষের মাঝের সময়টা যদি জমিতে কোনো চাষ না করা যায় তবে প্রাকৃতিক উপায়েই মাটি তার হারানো উপাদানগুলো ফিরে পায়। কারণ এই সময়ে মাঠে জমা হওয়া মৃত উদ্ভিদ, প্রাণী বা অন্যান্য জৈব বস্তু নানারকম জীবাণুর ক্রিয়ায় পচে মাটিতে মিশে যায়। ফলে মাটি তার ফুরিয়ে যাওয়া উপাদানগুলো আবার ফিরে পায়।

b) শস্য আবর্তন

মাটি থেকে পাওয়া পুষ্টি উপাদানের চাহিদা বিভিন্ন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম। একই জমিতে ক্রমাগত একই উদ্ভিদের চাষ করে গেলে ওই উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানগুলো মাটি থেকে ক্রমশ ফুরিয়ে যায়। তাই অনেকসময় দুটো চাষের মাঝে একবার শিম্বীগোত্রীয় উদ্ভিদ যেমন মটর, বিন, ছোলা বা ডালের চাষ করা হয়। এই ধরনের উদ্ভিদের মূলে বাসা বাঁধে রাইজোবিয়াম নামে একধরনের মিথোজীবী ব্যাকটেরিয়া। উদ্ভিদেরা

বাতাস থেকে সরাসরি নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে না। এই ব্যাকটেরিয়া পরিবেশ থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে উদ্ভিদের ব্যবহারযোগ্য নাইট্রোজেন যৌগে পরিবর্তিত করে উদ্ভিদদের দেয়। এই নাইট্রোজেনের যৌগগুলো উদ্ভিদদের ব্যবহারের পরে বাকিটা মাটিতে রয়ে যায়। তাই শিম্বীগোত্রীয় উদ্ভিদের ফসল তোলার পরেও মাটিতে যথেষ্ট নাইট্রোজেন থাকে। এর পরে ধান, গম ও ভুট্টা জাতীয় ফসল চাষ করলে এই উদ্ভিদেরা মাটি থেকে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেনের যৌগ গ্রহণ করতে পারে। তাই এই ধরনের ফসল একবার চাষ করে, মাঝে একবার শিম্বীগোত্রীয় উদ্ভিদের চাষ করলে মাটি আবার তার হারানো নাইট্রোজেন যৌগ ফিরে পায়। একই ফসল বারবার চাষ না করে মাঝে একবার অন্য ধরনের ফসল (বিশেষতঃ শিম্বীগোত্রীয় উদ্ভিদ) চাষ করা — এটাই হলো **শস্য আবর্তন**।

মাটির পুষ্টি উপাদানগুলো বজায় রাখার জন্য অনেকসময় মাটিতে নানারকম মিথোজীবী অণুজীব মেশানো হয়। এটাই অণুজীব সার। এই সার মাটির জলধারণ ক্ষমতা বাড়ায়। আর মাটিকে রন্ধ্রযুক্ত করে বায়ু চলাচল বাড়ায়।

4. জলসেচ (Irrigation)

প্রত্যেক জীবেরই বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন জল। উদ্ভিদের বেড়ে ওঠা আর ফুল-ফল-বীজের বিকাশের জন্য জল খুবই প্রয়োজন। তোমরা তো জানো যে উদ্ভিদ তার মূলের সাহায্যে জল শোষণ করে। আর জলের সঙ্গেই মাটি থেকে গ্রহণ করে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান আর সার।

উদ্ভিদের দেহে প্রায় 90 % জল থাকে। বীজের অঙ্কুরোদগমের জন্য জল একান্তই প্রয়োজন। তাছাড়াও জলের সঙ্গে মিশে পুষ্টি উপাদানগুলো উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গে পৌঁছোয়। ভালো ফসল পেতে গেলে মাটির আর্দ্রতা বজায় রাখা খুব জরুরি। মাঠের ফসলে নির্দিষ্ট সময় অন্তর তাই জল সরবরাহ করা দরকার। এটাই **জলসেচ**। সাধারণত নদী-হ্রদ, পুকুর, খাল-বিল, জলাধার, কুয়ো, টিউবওয়েল— এইসব উৎসের জল সেচের কাজে ব্যবহার করা হয়। অঞ্চলভেদে এই জল সংগ্রহ করার পদ্ধতিতেও ফারাক থাকে। তারপরে সেই জল খাল দিয়ে বা পাইপ দিয়ে ইলেকট্রিক বা ডিজেল পাম্পের সাহায্যে চাষের জমিতে পৌঁছে দেওয়া হয়। অনেকসময় ইলেকট্রিক বা ডিজেলের পরিবর্তে সৌরশক্তি বা বায়োগ্যাসও ব্যবহার করা হয়। এই কাজে চিরাচরিত পদ্ধতিতে সাধারণত মানুষের শ্রম বা পশুশক্তি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে এই পদ্ধতিগুলো তুলনায় সস্তা হলেও কম কার্যকরী হয়। আর জলেরও অপচয় ঘটে।

চিরাচরিত পদ্ধতি

দড়ি-বালতি-পুলি-নালা পদ্ধতি

দোলানো বালতি পদ্ধতি

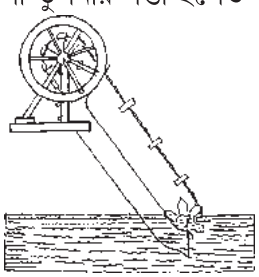

চেন পাম্প পদ্ধতি

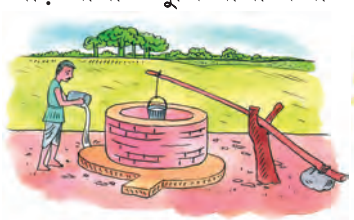

ঢেকাল পদ্ধাত

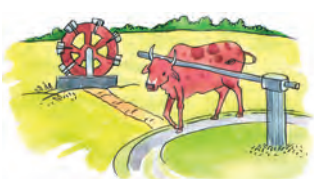

পারসি চাকা বা রাহাত পদ্ধতি

রাহাত পদ্ধতিতে একটা বড়ো কুয়ো আর চাকা ব্যবহার করা হয়। চাকার গায়ে অনেকগুলো বালতি লাগানো থাকে। পশুশক্তিকে কাজে লাগিয়ে ওই চাকাটা ঘুরিয়ে কুয়ো থেকে বালতিতে জল তোলা হয়। তারপর সেই জল চাষের জমিতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

আধুনিক পদ্ধতি : আধুনিক পদ্ধতিগুলোয় জলের অপচয় কমানো সম্ভব হয়।

ফোয়ারা পদ্ধতি (Sprinkler system)

চাষের জমিতে ফসলের ওপর ফোয়ারার মতো জল ফেলা হয়।

ড্রিপ পদ্ধতি (Drip system)

পাইপের সাহায্যে উদ্ভিদের মূলের ঠিক কাছে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরে পড়ার ব্যবস্থা করা হয়।

5. আগাছা দমন (Protection from weeds)

অনেকসময় চাষের জমিতে যে ফসলের চাষ করা হচ্ছে, সেটা ছাড়াও অন্যান্য আরও কিছু উদ্ভিদ জন্মায়। এই অপ্রয়োজনীয় উদ্ভিদগুলোই হলো আগাছা। এই আগাছাগুলো যে উদ্ভিদের চাষ করা হচ্ছে, তাদের জল, পুষ্টি উপাদান, থাকার জায়গা আর আলোয় ভাগ বসায়। তাই ফসলের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। কোনো কোনো আগাছা ফসল তোলায় বাধা সৃষ্টি করে। চাষিরা আগাছা নির্মূল করার জন্য নানা পদ্ধতি ব্যবহার করেন। জমিতে বীজ বোনার আগে চাষিরা যখন জমি চষেন তখনই আগাছাগুলো মূলশুদ্ধ উপড়ে আসে। আর তারপর শুকিয়ে গিয়ে মাটিতে মিশে যায়।

অ্যামারান্থাস ঘাস চেনোপোডিয়াম

চাষিরা অনেকসময় হাতে করে মাটি থেকে আগাছা তুলে ফেলেন। কখনও বা আগাছাগুলোকে মাটির খুব কাছ থেকে কেটে দেন। অনেকসময় আবার কিছু রাসায়নিক (যেমন 2, 4-D, ড্যালাপোন, পিক্লোরাম ইত্যাদি) স্প্রে করেও আগাছা দমন করা হয়। এই রাসায়নিক পদার্থগুলোই হলো আগাছানাশক (weedicide)। এই রাসায়নিকগুলো ফসলের কোনো ক্ষতি করে না। এই রাসায়নিক পদার্থগুলো মানুষের পক্ষে ক্ষতিকারক। তাই স্প্রে করার সময় চাষিদের নাক আর মুখ ঢেকে নেওয়া দরকার।

আগাছা দমনের কথা তো আমরা জানলাম। এবারে এসো এই ফাঁকে চাষের জমির কয়েকটা সাধারণ আগাছার নাম তোমাদের জানিয়ে রাখি। এরা হলো— পার্থেনিয়াম, অ্যামারান্থাস, চেনোপোডিয়াম, ঘাস ইত্যাদি।

6. ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ থেকে ফসলকে বাঁচানো (Protection from pests)

ইঁদুর, বিভিন্ন পোকা (পঙ্গপাল, উই, গুবরে জাতীয় পোকা) ফসল খেয়ে নেয় বা নষ্ট করে। এরাই হলো ফসল-ধ্বংসকারী প্রাণী (Pest)। পঙ্গপালরা দল বেঁধে উড়ে আসে আর আখ, গমের মতো উদ্ভিদের পাতা খেয়ে ব্যাপক ক্ষতি করে। কিছু পোকা আছে যারা কাণ্ডটা কুরে কুরে খায়। এরা হল stem borer। আবার উই উদ্ভিদের মূল খায়।

পঙ্গপাল

উই

গুবরে জাতীয় পোকা

এছাড়াও ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক আর ভাইরাসও উদ্ভিদে নানারকম রোগ সৃষ্টি করে ফসলের উৎপাদন কমিয়ে দেয়। কিছু ছত্রাক যেমন গমে মরিচা রোগ আর আলুতে ধসা রোগ সৃষ্টি করে। আবার কিছু ব্যাকটেরিয়া উইলট (Wilt) নামে একটা রোগ সৃষ্টি করে।

ফসল ধ্বংসকারী প্রাণীদের দমনের দুটি উপায় আছে - রাসায়নিক (Chemical) ও জৈবিক (Biological)।

রাসায়নিক দমন পদ্ধতি

ডিডিটি (DDT), বিএইচসি (BHC), ম্যালাথিওন পতঙ্গদের দমনে সাহায্য করে। সালফার আর তামার বিভিন্ন লবণ ছত্রাক দমনে সাহায্য করে। জিঙ্ক ফসফাইড আর ওয়ারফেরিন ইঁদুর জাতীয় প্রাণীদের দমন করে।

রাসায়নিক দমন পদ্ধতিতে ক্ষতিকারক প্রাণীদের মৃত্যু খুব তাড়াতাড়ি হলেও নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে।

i) অনেকসময় ক্ষতিকারক প্রাণীগুলো নির্দিষ্ট একটা রাসায়নিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

ii) আবার অনেকসময় এই রাসায়নিক পদার্থগুলো নদী বা হ্রদের জলে মিশে দূষণ ছড়ায়।

iii) রাসায়নিক পদার্থগুলো খাদ্যশৃঙ্খলে প্রবেশ করলে, খাদ্যশৃঙ্খলের শেষের দিকের জীবদের ক্ষতি হতে পারে।

iv) রাসায়নিক পদার্থগুলো ফল বা সবজির মাধ্যমে মানুষের দেহে প্রবেশ করলে নানা সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে।

v) রাসায়নিক পদার্থগুলো অনেকসময় উপকারী পতঙ্গদের (মৌমাছি, প্রজাপতি) মেরে ফেলে।

এইসব কারণেই অনেকসময় ফসল ধ্বংসকারী জীবদের দমনে জৈবিক দমন পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়।

জৈবিক দমন পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে একটি জীবকে অন্য জীবের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করা হয়। পরভুক (predator) আর পরজীবীদের (parasites) মাধ্যমে ফসল ধ্বংসকারী জীবদের নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়। প্রকৃতিগতভাবে কয়েক ধরনের মাকড়সা, বোলতা, ভীমরুল, গঙ্গাফড়িং ও বেশ কিছু ধরনের পাখি, ফসলের শত্রুদের (যেমন মথ, রস- শোষক পোকা, উই, উচ্চিংড়ে প্রভৃতি) ধরে খায়। তাছাড়াও কিছু ছত্রাক, প্রোটোজোয়া, ব্যাকটেরিয়া আর ভাইরাস ফসলের শত্রুদের দেহে পরজীবী রূপে বাস করে ওইসব জীবদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ রাখে।

7. ফসল তোলা (Harvesting)

ফসল পরিণত হলে ফসল সংগ্রহ করা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ফসল তোলার সময় ফসল বিশেষে কখনও হাত দিয়ে তোলা হয়। আবার কখনও বা মাটির খুব কাছ থেকে কাস্তে দিয়ে কেটে নেওয়া হয়।

কাস্তে

মাড়াই (Threshing)

দানা জাতীয় ফসলের ক্ষেত্রে ফসল উদ্ভিদকে (Crop plant) ভোজ্য অংশ থেকে আলাদা করতে হয়। এটাই হলো মাড়াই। অনেকসময় ফসল উদ্ভিদকে মাটিতে আছড়েও এই কাজটা করা হয়। কখনও বা মাটিতে ফসল উদ্ভিদটি রেখে তার ওপর দিয়ে গাধা বা ষাঁড়দের হাঁটানো হয়।

ঝাড়াই (Winnowing)

এরপর ঝাড়াই করে দানাশস্য আর ভূষি আলাদা করা হয়। এই কাজে সাহায্য নেওয়া হয় বাতাসের। উঁচু জায়গা থেকে ফেললে, ভূষি হালকা বলে হাওয়ায় উড়ে যায় আর দানাশস্যগুলো মাটিতে এসে পড়ে।

কম্বাইন হারভেস্টার (Combine Harvester) বা কম্বাইন (Combine) নামের মেশিনের সাহায্যে ফসল তোলা, মাড়াই আর ঝাড়াই সবই করা যায়।

কম্বাইন

ফসল তুলে নেওয়ার পর কাণ্ডের যে অংশগুলো চাষের জমিতে রয়ে যায়, সেগুলো আর ভূষি গবাদিপশুদের খাবার হিসাবে দেওয়া হয়। গবাদিপশুদের এই খাবারই হলো জাব (fodder)।

8. ফসল সঞ্চয় করে রাখা / মজুত করা (Storage)

ফসল তোলার পরে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য ফসল মজুত করে রাখা। দীর্ঘ সময় ধরে মজুত করার সময় পোকা, ইঁদুর আর বিভিন্ন অণুজীবদের হাত থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার। সদ্য সংগ্রহ করা ফসলে আর্দ্রতা বেশি থাকে। দানা জাতীয় শস্য শুকিয়ে নিয়ে মজুত না করা হলে, তাতে নানা অণুজীবের আক্রমণ ঘটতে পারে। তাই মজুত করার আগে দানা জাতীয় শস্য ভালো করে সূর্যের আলোয় শুকিয়ে নেওয়া দরকার। আর্দ্রতা কম থাকলে বিভিন্ন পোকা, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাকের আক্রমণ রোধ করা সম্ভব।

শস্যাগার

চাষিরা চটের ব্যাগ বা ধাতব পাত্রে দানাজাতীয় শস্য রাখেন। এছাড়াও ব্যাপক মাত্রায় সঞ্চয়ের জন্য শস্যাগার বা বায়ুহীন ঘর (Silo) ব্যবহার করা হয়। উন্নত মানের এইসব শস্যাগার বায়ুহীন, আর্দ্রতাশূন্য হয়। ইঁদুর জাতীয় প্রাণী এখানে ঢুকতে পারে না। এমনকি সারাক্ষণ একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় রাখার ব্যবস্থাও থাকে এখানে। অনেকসময় ফসল মজুত করার আগে ফসলের গুদামে আর ফসল মজুত রাখার ব্যাগ বা পাত্রে কীটনাশক আর ছত্রাকনাশক স্প্রে করা হয়।

বর্তমানে শস্যাগারের মধ্যে সারাক্ষণ নাইট্রোজেন গ্যাস চালনা করার ফলে ফসল-ধ্বংসকারী জীবেরা(ইঁদুর জাতীয় প্রাণী, পোকা আর অণুজীব) শস্যাগারের মধ্যে অক্সিজেনের অভাবে বাঁচতে পারে না।

বীজ সংরক্ষণ: পরের মরসুমে চাষের জন্য চাষিরা বীজ সংরক্ষণ করেন। এছাড়াও হারিয়ে যেতে বসা বিভিন্ন শস্যের বীজও নানাভাবে সংরক্ষণ করা হয়।

উদ্ভিদজাত খাদ্য চাষের বিভিন্ন পদ্ধতি

ধান

ধান পৃথিবীর এক গুরুত্বপূর্ণ শস্য। ভারতের অন্যতম প্রধান খাদ্যশস্য হলো ধান।

তুমি কতরকম ধানের কথা জানো বা শুনেছ? তোমার এলাকায় চাষের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করে জানার চেষ্টা করো সেই অঞ্চলে কোন কোন ধানের চাষ হয়। আগে হতো অথচ এখন আর চাষ হয় না এমন ধানের নামও তাঁদের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করো।

তোমার জানা ধানের নাম	এখন যেসব ধানের চাষ হয়	এখন যেসব ধানের চাষ আর হয় না

ধান ক্ষেতের ছবি আঁকো।

ভারতের কোথায় কোথায় ধান চাষ হয়

ভারতের প্রায় সব রাজ্যেই কম-বেশি ধান চাষ হয়। তবে পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা, আর তামিলনাড়ুতে ধানের উৎপাদন যথেষ্ট ভালো।

চালের পুষ্টিমূল্য

ধান থেকে পাওয়া যায় চাল। চালে 79.1% কার্বোহাইড্রেট, 6% প্রোটিন আর 0.4% বিভিন্ন মৌল থাকে। এছাড়াও থাকে ভিটামিন B- কমপ্লেক্স আর অন্যান্য কিছু ভিটামিন। এছাড়াও ধানের ভূষি থেকে তেল পাওয়া যায়।

ধানের প্রকারভেদ

জাতিগত বৈশিষ্ট্য আর চাষ করার পদ্ধতি অনুসারে ধানকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। এরা হলো আউশ বা শরৎকালীন ধান, আমন বা শীতকালীন ধান আর বোরো বা গ্রীষ্মকালীন ধান।

উৎপাদন ক্ষমতা অনুসারে আবার ধানকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়— অপেক্ষাকৃত কম ফলনশীল দেশি প্রকারের ধান আর উচ্চফলনশীল প্রকারের ধান।

এবারে আউশ, আমন আর বোরো ধানের চাষ সম্বন্ধে সাধারণ কয়েকটা কথা জেনে নিই।

আউশ

আউশ ধান সাধারণত জমিতে একেবারে সরাসরি বোনা হয়। তাই এর চাষের পদ্ধতি, আমন ও বোরো ধান চাষের পদ্ধতির থেকে একটু আলাদা। সাধারণত রবি ফসল তুলে নেওয়ার পরেই জমি তৈরি করে জমিতে ধান বোনা হয়। পলি, দোঁয়াশ বা এঁটেল — প্রায় সব ধরনের মাটিতেই আউশ ধান বোনা হয়। কোনো কোনো অঞ্চলে অবশ্য সরাসরি বীজ না বুনে, বীজতলা তৈরি করেও আউশ ধান বোনা হয়।

আমন

যে-কোনো ধরণের মাটিতে বর্ষাকালে আমন ধানের চাষ করা হয়। তবে কাদা মাটি বা এঁটেল মাটিই চাষের জন্য ভালো। পশ্চিমবঙ্গে আমন ধানের চাষই বেশি। আমাদের দেশে প্রায় কয়েক হাজার জাতের আমন ধান রয়েছে। বিভিন্ন প্রকার দেশি জাতগুলো বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে পরিচিত। দেশি আমন ধানের মধ্যে উৎকৃষ্ট জাতগুলো হলো — ভাসামানিক, ঝিঙ্গাশাল, রঘুশাল, পাটনাই - 23, বাসমতী প্রভৃতি। আমন ধান চাষের জন্য আগে বীজতলায় বীজ ফেলে চারাগাছ তৈরি করা হয়। এরপরে চাষের জমিতে চারাগাছগুলো রোপণ করা হয়। বীজতলায় ফেলার আগে বীজগুলো শোধন করে নেওয়া দরকার।

বোরো

আমন ধান কাটার পরে বীজতলা তৈরি করে এই ধরনের ধান রোপণ করা হয়। আর মার্চ-এপ্রিল মাস নাগাদ ধান কাটা হয়। যেসব অঞ্চলে জলসেচের ব্যবস্থা আছে, সেখানে বোরো ধানের চাষ হয়।

ধান কত তাড়াতাড়ি পাকে, তার ভিত্তিতে আবার ধানকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

i) জলদি জাত/স্বল্পমেয়াদি জাত — ধান খুব তাড়াতাড়ি পেকে যায়। যেমন রত্না জাতের ধান 95-115 দিনের মধ্যে পেকে যায়।

ii) মাঝারি জাত/মধ্যমেয়াদি জাত — ধান পাকতে মাঝারি রকম সময় লাগে। জয়া, জয়ন্তী প্রভৃতি জাতের ধান 116-135 দিনের মধ্যে পাকে।

iii) নাবি জাত বা দীর্ঘমেয়াদি জাত — ধান পাকতে বেশিদিন সময় লাগে। স্বর্ণ, মাসুরি, পঙ্কজ প্রভৃতি ধান পাকতে 140-150 দিন সময় লাগে।

আউশ, আমন, বোরো সবারই জলদি, মাঝারি আর নাবি জাতের ধান আছে। আর একটা কথাও কিন্তু খেয়াল রেখো, একই জাতের ধানকে আউশ, আমন বা বোরো এই তিন মরশুমেই চাষ করা যায়।

গোল্ডেন রাইস : ভিটামিন A-এর চাহিদা মেটাতে কৃষি বিজ্ঞানীরা এই বিশেষ ধরনের ধান তৈরি করেছেন।

নীচের তালিকায় আউশ, আমন ও বোরো ধান চাষের একটা সাধারণ সময়সূচি দেওয়া হলো।

ধানের প্রকার	বীজতলা তৈরি করা	ধান রোপণ করা	ধান বোনা	ধান কাটা
1. আউশ	x x x	x x x	উঃবঙ্গ: মার্চ-এপ্রিল দঃবঙ্গ: মে-জুন	জুলাই-সেপ্টেম্বর
2. আমন	জুন-জুলাই	জুলাই-আগস্ট	x x x	ডিসেম্বর-জানুয়ারি
3. বোরো	নভেম্বর	ডিসেম্বর	x x x	এপ্রিল-মে

চাষের পদ্ধতি

চাষের ধাপ	কী করা হয়
i) বীজ বাছাই	ঘন নুন জলে বীজগুলোকে ডুবিয়ে নাড়ানো হলে সুস্থ আর পুষ্ট বীজগুলো ভারী বলে জলে ডুবে যায়। এই বীজগুলোকে পরিষ্কার জলে ধুয়ে শুকিয়ে নিতে হয়।
ii) বীজ শোধন	*a) শুষ্ক শোধন পদ্ধতি :* জমিতে সরাসরি বীজ বোনার জন্য বা শুকনো বীজতলায় বীজ বোনার জন্য এই পদ্ধতি কাজে লাগে। বীজবাহিত রোগজীবাণু ধ্বংস করার জন্য বীজের সঙ্গে রাসায়নিক পদার্থের গুঁড়ো মেশানো হয়।
	b) সিক্ত শোধন পদ্ধতি : সিক্ত বীজতলায় অঙ্কুরিত বীজ বোনার জন্য এই পদ্ধতি উপযোগী। বীজবাহিত রোগজীবাণু ধ্বংসের জন্য বীজগুলোকে রাসায়নিক পদার্থের জলীয় মিশ্রণে ভিজিয়ে রাখা হয়। অনেকসময় উষ্ণ জলেও বীজ শোধন করা হয়।
iii) বীজতলা প্রস্তুতি ও চারাগাছ তৈরি	*a) শুষ্ক বীজতলা :* খারিফ ঋতুতে ভালো বৃষ্টি হয় এমন অঞ্চলের পক্ষে শুষ্ক বীজতলা উপযোগী। হালকা লাঙল দিয়ে জমি দু-একবার চষে, জমির আগাছা নির্মূল করা হয়। জমি চষার সময় যথাযথ পরিমাণে জৈব বা অজৈব সার ব্যবহার করা হয়। চারাগাছগুলো 5-6 টি পাতাবিশিষ্ট আর 12-15 সেমি লম্বা হলে রোপণের উপযোগী হয়ে ওঠে।
	b) সিক্ত বা কাদান বীজতলা : নির্বাচিত জমিতে জল বেঁধে রেখে জৈব সার দেওয়া হয়। মাটি নরম হয়ে উঠলেই জমি চষতে হয়। ফলে কয়েকদিনের মধ্যে মাটি কাদা কাদা হয়ে যায়। জমিতে পরিমাণমতো অজৈব সার দেওয়া হয়। এরপর বীজতলায় অঙ্কুরিত বীজ বোনা হয়। পর্যায়ক্রমে বীজতলাকে শুকনো আর জলসেচ করার ফলে চারাগাছগুলোর মূলের বৃদ্ধি ভালো হয়। প্রয়োজনমতো কীটনাশক ওষুধ ও সার দেওয়া হয়।
(iv) জমি তৈরি	*a) শুষ্ক পদ্ধতি :* আউশ ধান ও কোনো কোনো অঞ্চলে নীচু জমিতে আমন ধান চাষ করার সময় বীজতলা ব্যবহার না করে জমিতে সরাসরি বীজ বোনা হয়। রবি শস্য তুলে নেওয়ার পরেই দু-একবার চষে জমি ফেলে রাখা হয়। তার ফলে জমির আগাছাগুলো নষ্ট হয় আর জমি বেশ শুকনো হয়। জমিতে পরিমাণমতো জৈব আর অজৈব সার দেওয়া হয়।

চাষের ধাপ	কী করা হয়
	b) সিক্ত বা কাদান জমি তৈরি: সিক্ত বীজতলা থেকে ধানের চারাগাছ রোপণ করার জন্য সিক্ত বা কাদান জমি তৈরি করা প্রয়োজন। শুষ্ক পদ্ধতির মতো রবি শস্য তুলে নেওয়ার পর দু-একবার চষে জমি ফেলে রাখা হয়। এইসময় জমিতে 5 সেন্টিমিটারের মতো গভীর জল 2-4 দিন বেঁধে রেখে লাঙল দিয়ে কয়েকবার চষলে মাটি কাদা কাদা হয়ে যায়। শেষবার জমি চষার সময় প্রয়োজনমতো জৈব ও অজৈব সার দেওয়া হয়।
v) বীজ বোনা আর চারাগাছ রোপণ	*a)* **বীজ বোনা :** আউশ ধানের বীজ সরাসরি জমিতে বোনা হয়। মাটি বেশ নরম থাকতে থাকতেই, হাতে করে ছিটিয়ে বা জমি চষার সময় লাঙলের পেছনে তৈরি হওয়া খাতে হাত দিয়ে বীজ ফেলে বা বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে জমিতে বীজ বোনা হয়।
	b) **চারাগাছ রোপণ :** সকালের দিকে বীজতলা থেকে চারাগাছগুলোকে সাবধানে তুলে আনা হয়। তারপর তৈরি জমিতে 2-3 সেন্টিমিটারের মতো জল বেঁধে রেখে সারিবদ্ধভাবে চারাগাছগুলো রোপণ করা হয়।
vi) সার প্রয়োগ	জমির উর্বরতার মান আর ধানের জাত অনুসারে সারের প্রকার আর মাত্রা বিভিন্ন রকমের হয়। এক্ষেত্রে জৈব আর অজৈব দু-রকম সারই ব্যবহার করা হয়।
vii) অন্তবর্তী কর্ষণ ও পরিচর্যা	ধান জমিতে সময়ে সময়ে নিড়ান দিলে জমির আগাছা সহজে দমন করা যায়। মাটিও নরম থাকে আর চারাগাছগুলোর বৃদ্ধিও ভালো হয়। অনেকসময় রাসায়নিক আগাছানাশক পদার্থ ব্যবহার করেও ধানজমির আগাছা ধ্বংস করা হয়।
viii) জলসেচ	রোপণ করা আউশ, আমন আর বোরো ধানের বেড়ে ওঠার সময় ও পরিণত অবস্থায় গাছের গোড়ায় 30 মিলিমিটার থেকে 50 মিলিমিটার গভীর জল থাকা প্রয়োজন। এছাড়াও খারিফ ঋতুতে অনিয়মিত বৃষ্টিপাতে, প্রাক-খারিফ ও বোরো ধান চাষে নিয়মিত জলসেচের প্রয়োজন হয়।
ix) ফসল তোলা	ফসল তুলে আঁটি বেঁধে খামারে তোলা হয়। এরপর মাড়াই করে দানাগুলোকে খড় থেকে আলাদা করে নেওয়া হয়।

আম

ফলের রাজা হলো আম। তোমরাও নিশ্চয়ই আম খেয়েছ। তোমরা কোন কোন ধরনের আমের নাম জানো? সেই নামগুলো নীচের সারণিতে লিখে ফেলো। বছরের কোন সময়ে ওই আম হয় সেটাও লেখো।

আমের নাম	বছরের কোন সময় হয়

আম থেকে কী ধরনের খাবার তৈরি হয়?

আমের জন্মস্থান আমাদের এই ভারতবর্ষ। পরে আম নিয়ে যাওয়া হয়েছে শ্রীলঙ্কা, ব্রহ্মদেশ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে। ভারতে প্রায় সব জায়গাতেই কম বেশি আমের চাষ হয়। পশ্চিমবঙ্গে মালদা, মুর্শিদাবাদ আর নদিয়াতে সবচেয়ে বেশি আমের চাষ হয়।

আমগাছ তো নিশ্চয়ই দেখেছ। আম গাছের ছবি আঁকো।

আমের গুণাগুণ

ভালো জাতের আমে সুন্দর গন্ধযুক্ত শাঁস থাকে ; আঁশ না থাকাই বাঞ্ছনীয়। আমে থাকে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট ও খনিজ পদার্থ (Ca, P, Fe ইত্যাদি)। প্রচুর পরিমাণে থাকে ভিটামিন A, B-কমপ্লেক্স ও C। এছাড়াও থাকে জল, তন্তু আর ফাইটোকেমিক্যাল (বিটা-ক্যারোটিন)।

আবহাওয়া

এবারে দেখে নেওয়া যাক কীরকম আবহাওয়া আমের বেড়ে ওঠার পক্ষে উপযোগী। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 1500 মিটার উচ্চতা অবধি আম গাছ ভালো জন্মায়। কিন্তু বেশি উচ্চতায় আম গাছ বাড়লেও বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা যায় না। আমগাছে মুকুল আসার সময় আকাশ বেশ পরিষ্কার থাকা, তুষারপাত ও কুয়াশা না হওয়া একান্তভাবে জরুরি। কারণ বৃষ্টিপাত ও কুয়াশা আমের মুকুলের পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকারক।

মাটি কেমন হওয়া দরকার

আম বিভিন্ন ধরনের মাটিতে জন্মায়। কিন্তু তবুও নদী অববাহিকার পলিমাটি আর উর্বর দোঁয়াশ মাটি আম চাষের পক্ষে বিশেষভাবে উপযুক্ত। বেলে মাটি আর কাদা বা এঁটেল মাটি আম চাষের পক্ষে অনুপযুক্ত।

আমের জাত

হিমসাগর, বোম্বাই, ল্যাংড়া, গোলাপখাস, সফদরপসন্দ বা বীড়া, পেয়ারাফুলি, রানিপসন্দ, ঝুমকোফজলি, নীলাম, চৌসা, দশেরি, আম্রপালি, আলফানসো, বেগমফুলি — সারা ভারতে নানা জাতের আম পাওয়া যায়। তাদের স্বাদ আর গন্ধও আলাদা আলাদা রকমের। পশ্চিমবঙ্গে হিমসাগর, গোলাপখাস, সফদরপসন্দ বা বীড়া, পেয়ারাফুলি, রানিপসন্দ, ঝুমকোফজলি প্রায় প্রতি বছরই ফলন দেয়। এই ব্যাপারে ল্যাংড়া বড়োই খামখেয়ালি। প্রতি বছর ঠিকমতো ফলন পাওয়া যায় না। পশ্চিমবঙ্গের যে আমগুলোর নাম করা হলো, তাদের মধ্যে সবচেয়ে আগে পাকে গোলাপখাস আর সব থেকে শেষে ঝুমকোফজলি। ঝুমকোফজলি আসলে একজাতের ফজলি। আকারে কিছুটা ছোটো। থোকা থোকা হয়ে ফলে। প্রচুর পরিমাণে আর নিয়মিত ফলে।

বংশবিস্তার

বীজ থেকে আমের বংশবিস্তার করার রেওয়াজই অনেককাল ধরে বহুল প্রচলিত। কিন্তু বীজের আম গাছে কখনও তার জাত-বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি বজায় থাকে না। একটা ভালো জাতের আমের আঁটি পুঁতলে যে চারাগাছটা জন্মাবে, তাতে কিন্তু ওই ভালো জাতের সব গুণবিশিষ্ট আম ফলবে না।

এই সমস্যা এড়াতে ভালো জাতের আম গাছ থেকে কলম করা হয়। কলম থেকে তৈরি চারাগাছের ভালো জাতের সব গুণ বজায় থাকে। তোমরা নিশ্চয়ই ভাবছ, কলম করা আবার কী? তোমরা হয়তো দেখেছ যে করবী বা জবা গাছের একটা ডাল কেটে মাটিতে পুঁতে দিলে, সেখান থেকে নতুন গাছ বেরোয়। এটাও কিন্তু একধরনের

কলম করা। একে বলে শাখাকলম। অর্থাৎ উদ্ভিদের কোনো একটা অঙ্গ থেকে নতুন উদ্ভিদ তৈরি করা। এটা উদ্ভিদের একধরনের অঙ্গজ বিস্তার (propagation) যা কৃত্রিম পদ্ধতিতে করানো হয়।

আমগাছের কলম বিভিন্ন পদ্ধতিতে করা হয়— যেমন জোড় কলম, ভিনিয়ার কলম, চিপ কলম, আঁটির কলম। আমরা এখানে কেবল সবচেয়ে প্রচলিত যে কলম পদ্ধতি, জোড় কলম, সেটা নিয়ে সংক্ষেপে জানব।

আমের জোড়কলম

আঁটি থেকে তৈরি করা একটা চারাগাছের (স্টক) সঙ্গে উন্নত জাতের আম গাছের (সিয়ন) শাখা এক সঙ্গে জোড় বেঁধে কলম করা হয়। সেইজন্য এই পদ্ধতির নাম জোড়কলম। সাধারণত আষাঢ় মাসে এই কলম করা হয়।

i) কলম করার জন্য চারাগাছ আর উন্নত জাতের আমগাছের শাখা, দুটোরই কিছুটা করে অংশ কেটে নিয়ে দুটোকে জোড়া লাগিয়ে সুতলি দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। জোড়া না লাগা পর্যন্ত চারাগাছটাতে জল দেওয়া হয়।

ii) জোড়া লাগা সম্পূর্ণ হলে নির্বাচিত সিয়ন গাছটার জোড়ের নীচের দিকের অংশ ও চারাগাছের জোড়ের ওপরের দিকের অংশ একবারে না কেটে 2 থেকে 3 বারে কেটে ফেলা হয়। (কাটার জায়গাটা ছবিতে তিরচিহ্নের সাহায্যে দেখানো হয়েছে।)

iii) জোড়কলমের মাধ্যমে তৈরি হওয়া গাছটাকে কয়েকদিনের জন্য ছায়ায় রাখা হয়। তারপর নার্সারিতে লাগানো হয়।

চাষের পদ্ধতি

চাষের ধাপ	কী করা হয়
i) জমি তৈরি	পর্যাপ্ত সূর্যের আলো আসে আর জল নিষ্কাশনের ভালো ক্ষমতা আছে এমন উঁচু জমি বেছে নেওয়া হয়। ভালোভাবে চষে জমি সমান করে নেওয়া হয়। এরপর জমিতে শণের বীজ বোনা হয়। শণ গাছগুলোর বয়স 5-6 সপ্তাহের মতো হলে লাঙল ও মইয়ের সাহায্যে মাটিতে ভালোভাবে মাড়িয়ে, পচিয়ে সবুজ সার তৈরি করা হয়।
ii) চারাগাছ লাগানো	কলম করার অন্তত কয়েকমাস পরে চারাগাছ লাগানোই ভালো। আমাদের দেশে সাধারণত বর্ষায় চারাগাছ লাগালেই ভালো হয়। সমান দূরত্বে গর্ত খুঁড়ে, গর্ত থেকে তোলা মাটির সঙ্গে পরিমাণ মতো গোবর সার, সুপার ফসফেট আর ছাই মিশিয়ে আবার গর্তগুলো ভরতি করে দেওয়া হয়। এরপর চারাগাছগুলোকে সোজাভাবে লাগিয়ে প্রতিটা গাছে একটা করে কাঠি পুঁতে হালকাভাবে বেঁধে দিলে গাছ সোজাভাবে বেড়ে ওঠে।
iii) সার প্রয়োগ	নিয়মিত ও পরিমাণমতো আমের ফলন পেতে হলে প্রতি বছরই সঠিক পরিমাণে সার দেওয়া প্রয়োজন। গাছের প্রাথমিক বৃদ্ধিতে নাইট্রোজেনের চাহিদা বেশি থাকে। তাই অ্যামোনিয়াম সালফেট বা ইউরিয়া দেওয়া হয়।
iv) জলসেচ	চারাগাছের 6 মাস বয়স পর্যন্ত সপ্তাহে দুবার আর তারপর সপ্তাহে একবার করে সেচের ব্যবস্থা করতে পারলে ভালো হয়। গাছ বড়ো হয়ে গেলে 15 দিন অন্তর সেচ দেওয়া উচিত।

চাষের ধাপ	কী করা হয়
v) অন্যান্য পরিচর্যা	আমগাছ লাগানোর পর শুধু জল আর সার দিলে চলবে না। সেইসঙ্গে বাগানের জমি নিয়মিত চষে পরিষ্কার রাখতে হয় — একবার বর্ষার শুরুতে আর একবার বর্ষার শেষে। এর ফলে ঝরে পড়া পাতা আর আগাছা মাটির সঙ্গে মিশে জৈব সারে পরিণত হয়।
vi) ফল সংগ্রহ	ফুল থেকে ফল আসতে প্রায় 4-5 মাস সময় লাগে। পশ্চিমবঙ্গে সাধারণত পৌষ-মাঘ মাসে আমে মুকুল আসে। আম পুরোপুরি পাকার আগেই গাছ থেকে পেড়ে নেওয়া উচিত। নইলে পাখিতে আম নষ্ট করে। আম যখন ফিকে-সবুজ হতে আরম্ভ করে, তখনই বোঝা যায় যে আম পাড়ার সময় হয়েছে।
vii) ফলন	কলমের আমগাছে পরের বছরেই ফুল চলে এলেও 5 বছরের আগে গাছ থেকে ফল নেওয়া উচিত নয়। মুকুল এলেই ভেঙে দিতে হয়। গাছের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফলের সংখ্যা ও পরিমাণ বাড়তে থাকে।
viii) ফল সংরক্ষণ	উন্নত জাতের আমকে পরিণত, শক্ত ও সবুজ অবস্থায় তুলে ভালোভাবে প্যাকিং করে হিমঘরে যথাযথ উষ্ণতা আর আর্দ্রতায় বেশ কয়েক সপ্তাহ ভালোভাবে রাখা যায়।

চা

চা-এর সঙ্গে তোমাদের সবারই অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইরাবতী নদীর অববাহিকা চায়ের আদি নিবাস। চিনা ভাষায় Tey থেকে Tea শব্দটা এসেছে বলে মনে করা হয়। চিন, ভারত, কেনিয়া, শ্রীলঙ্কা আর টার্কি পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি চা উৎপাদন করে। ভারতের প্রধান চা উৎপাদনকারী রাজ্যগুলো হলো আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু আর কেরালা। 1000 থেকে 2500 মিটার উঁচু এলাকার পাহাড়ের গায়ে আম্লিক মাটিতে চায়ের চাষ হয়। ভারতে নানা ধরনের চা পাওয়া যায়। তার মধ্যে দার্জিলিং, আসাম আর নীলগিরির চা বিখ্যাত।

চায়ের গুণাগুণ

i) চা পান করলে শরীরে উদ্দীপনা আসে। এর মূলে আছে চায়ে ক্যাফিনের উপস্থিতি।

ii) চায়ে থাকে ফ্ল্যাভোনয়েড, ট্যানিন, উদ্‌বায়ী তেল আর ভিটামিন B- কমপ্লেক্স — যা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো।

iii) চায়ে উপস্থিত পলিফেনল রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। এছাড়া উচ্চ রক্তচাপ, হেপাটাইটিস সারাতেও সাহায্য করে।

iv) চায়ের প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড, ক্যাফিন ও থিয়োফাইলিন স্নায়ুকে উদ্দীপিত করে আর হৃৎপিণ্ডকে ভালো রাখে।

v) চায়ে বেশি পরিমাণে থাকা ফ্লুওরাইড দাঁতের ক্ষয় রোধ করে।

vi) কালো চায়ে প্রচুর ভিটামিন B-কমপ্লেক্স আর ফলিক অ্যাসিড থাকে। এদের প্রদাহ-প্রতিরোধী আর ক্যানসার-প্রতিরোধী ভূমিকা আছে।

vii) সবুজ চায়ে থাকে ভিটামিন K যা শরীরের ভেতরে হওয়া রক্তক্ষরণ, রিউম্যাটিক প্রদাহ আর হার্ট অ্যাটাক হতে বাধা দেয়।

চা গাছের প্রকারভেদ

উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরা *Camellia* গণের অন্তর্ভুক্ত চা উৎপাদনকারী তিন ধরনের গাছকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করেন। এরা হলো চিনা জাত, আসামি জাত আর ক্যাম্বোড সংকর জাত। এছাড়াও চা তৈরি করা হয় না অথচ *Camellia* গণের অন্তর্ভুক্ত এরকম আরো অনেক প্রজাতির উদ্ভিদ আছে। বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা হয় এমন চা গাছের উৎপত্তিতে এদের সবার ভূমিকা রয়েছে। তাই বাণিজ্যিক চা গাছগুলোকে বিশেষ কোনো জাতের বলে চিহ্নিত করা মুশকিল।

বংশ বিস্তার (Propagation)

বীজ থেকে বা উদ্ভিদ অঙ্গ থেকে, এই দু-ভাবেই চা গাছের বংশবিস্তার করানো হয়।

বীজ থেকে

ভালো জাতের সুস্থ, সবল আর সতেজ বীজ বেছে নেওয়া হয়। এরপর বালির ওপরে (Sand bed) বীজগুলোর অঙ্কুরোদগম ঘটানো হয়। অঙ্কুরিত বীজগুলোকে পলিথিনের প্যাকেটে নার্সারি বাগিচায় স্থানান্তরিত করা হয়। নার্সারি বাগিচায় জল নিষ্কাশনের ভালো ব্যবস্থা থাকা দরকার। মাথার ওপর শামিয়ানা খাটিয়ে বা প্যান্ডেল তৈরি করে ছায়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। 15-18 মাস পরে চারাগাছগুলো অন্য জায়গায় স্থানান্তরণের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।

অঙ্গজ বিস্তার

পর্ব থেকে কেটে নেওয়া শাখা অঙ্গজ বিস্তারের জন্য ব্যবহার করা হয়। ছায়া নেই এমন জায়গায় জন্মানো আর পাতা তোলা হয় না এমন চা গাছের ঝোপ থেকে শাখা কেটে নেওয়া হয়। সাধারণত সকালে আর সন্ধ্যায় এই কাজটা করা হয়। সাধারণত 3- 4 সেন্টিমিটার লম্বা শাখা কাটা হয় যাতে একটা পাতা আর একটা ফোলা সুপ্ত কাক্ষিক মুকুল আছে। এই কেটে নেওয়া শাখাগুলোকে এরপর নার্সারি বাগিচা আর তারপর পলিথিনের প্যাকেটে স্থানান্তরিত করা হয়। শামিয়ানা বা প্যান্ডেল খাটিয়ে ছায়ার ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণত 12-18 মাস বয়সের চারাগাছ চাষের জমিতে লাগানো হয়।

চাষের পদ্ধতি

চাষের ধাপ	কী করা হয়
i) জমি তৈরি	চা চাষের জমিতে দাঁড়িয়ে থাকা সব উদ্ভিদ মূলশুদ্ধ উপড়ে ফেলা হয়। কারণ মাটির নীচে মূল রয়ে গেলে সেখান থেকে নতুন চা উদ্ভিদে নানা রোগের সংক্রমণ ঘটতে পারে। তারপর অন্তত 45 সেন্টিমিটার অবধি গভীরভাবে মাটি চষা হয়। এরপর গুয়াটেমালা ঘাস, সিট্রোনেলা ঘাস, ক্রোটালারিয়া ও আরও অন্যান্য কিছু উদ্ভিদের চাষ করা হয়। NPK জাতীয় অজৈব সার বা জৈব সার দেওয়া হয়। এই ধরনের ফসলের চাষ মাটির গঠন উন্নত করে আর মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বাড়ায়। এইসব ফসলের উপস্থিতি মাটিতে থাকা বহু রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুদের মেরে ফেলতে বা নিষ্ক্রিয় করতে সাহায্য করে। এরপর এই উদ্ভিদগুলোকে সরিয়ে দিয়ে চা গাছের চারা রোপণের প্রস্তুতি শুরু করা হয়।

চাষের ধাপ	কী করা হয়
ii) চারাগাছ রোপণ	রোপণের এক সপ্তাহ আগে গভীর গর্ত খোঁড়া হয়। এরপর গর্তগুলো জমির ওপরের স্তরের মাটি (top soil) দিয়ে ভরতি করে 12-18 মাসের চারাগাছগুলো পোঁতা হয়। চারাগাছগুলোর গোড়ার চারধারে ভেজা পাতা, খড় ইত্যাদি রাখা হয় (mulching) ।
iii) ছায়ার ব্যবস্থা	ক্রান্তীয় আর উপ-ক্রান্তীয় অঞ্চলে ছায়ায় চা গাছের চাষ করা হয়। চা গাছকে এই ছায়া দেয় কিছু ছায়া তরু (Shade tree)। ছায়া তরুরা সূর্যের বিকিরণের বেশ কিছু অংশ শোষণ করে চারপাশের তাপমাত্রা কমিয়ে দেয়। ফলে গ্রীষ্মে চা পাতার সালোকসংশ্লেষের যথাযথ হার বজায় থাকে। ছায়া তরুর পাতা মাটিতে পড়ে মাটির জৈব পদার্থের পরিমাণও বাড়ায়। সিলভার ওক জাতীয় গাছ ছায়া তরুর কাজ করে।
iv) আগাছা দমন	চা বাগানে একবীজপত্রী আর দ্বিবীজপত্রী, এই দু-ধরনের আগাছাই জন্মায়। আগাছানাশক নানা রাসায়নিক পদার্থ (ডাইইউরন, সিমাজিন, 2.4-D ইত্যাদি) ব্যবহার করা হয়। জলের সঙ্গে মিশিয়ে এই আগাছানাশকগুলো স্প্রে করা হয়।
v) সার প্রয়োগ	চা যেহেতু একটা পাতা জাতীয় ফসল, তাই নাইট্রোজেনযুক্ত সার প্রয়োগে উৎপাদন বাড়ে। ইউরিয়া, অ্যামোনিয়াম সালফেট বা ক্যালশিয়াম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট প্রভৃতি সার ব্যবহারের মাধ্যমে মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়ানো হয়।
vi) জলসেচ	উত্তর- পূর্ব ভারতে শুখা মরশুমে (অক্টোবর-ফেব্রুয়ারি) সাধারণত ফোয়ারা পদ্ধতিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়।
vii) ফসল তোলা	অগ্রমুকুল, পর্বমধ্য আর তার ঠিক নীচের 2টো বা 3টে পাতাযুক্ত চা গাছের নবীন শাখা তোলা হয় অর্থাৎ 1 টা কুঁড়ি আর 2 টো বা 3 টে পাতা। এই কাজের ওপরেই নির্ভর করে চায়ের উৎপাদন আর চায়ের গুণাগুণ। বাণিজ্যিক চাগাছগুলো থেকে বছরে 35-40 বার পাতা তোলা হয়। একেকবার প্রতিটি গাছ থেকে 10-15 গ্রাম পাতা তোলা হয়।
viii) চা-পাতা তৈরি	চা গাছ থেকে তোলা পাতা কিন্তু চা তৈরির জন্য উপযুক্ত নয়। তোলার পরে নানারকম পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পরেই চা-পাতা চা তৈরির উপযুক্ত হয়ে ওঠে।
ix) চায়ের গুণাগুণ পরীক্ষা	চা-পাতা তৈরির একটা গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো চায়ের স্বাদ পরীক্ষা করে দেখা । বিক্রির আগে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন চা পরীক্ষকরা চায়ের স্বাদ, বর্ণ, গন্ধ পরীক্ষা করে দেখেন।

চা পাতা তৈরির ধরন অনুযায়ী বাণিজ্যিক চা-কে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এই তিন ধরনের চা হলো — কালো চা (Black tea), সবুজ চা (Green tea) আর উলং চা (Oolong tea)। সারা পৃথিবীর চা উৎপাদনের প্রায় 75 শতাংশই হলো কালো চা।

প্রাণিজ খাদ্য চাষের বিভিন্ন পদ্ধতি

আমরা উদ্ভিদ থেকে যেমন নানা ধরনের খাবার পাই, তেমনই প্রাণীদের থেকেও পাই। তোমরা এর আগে দেখেছ যে উদ্ভিদজাত খাবার পেতে গেলে চাষ করতে হয়। একইভাবে প্রাণীজাত খাবার নিয়মিত আর যথেষ্ট পরিমাণে পেতে গেলেও সেইসব প্রাণীদের যত্নের সঙ্গে প্রতিপালন করা দরকার। আর সেইসঙ্গে দরকার তাদের প্রজননের সুব্যবস্থা করা। এটাই হলো পশুপালন (Animal husbandry)।

আমরা এখানে মৌমাছি, মাছ আর মুরগি পালন সম্বন্ধে জানব।

মৌমাছি

মৌমাছি তোমরা অনেকেই দেখেছ। আর মৌচাক দেখেছ? গাছের ডালে, বাড়ির কার্নিসে, ঝোপঝাড় বা অন্যান্য জায়গায় মৌচাক ঝুলে থাকতে দেখেছ নিশ্চয়ই। মৌমাছিদের কাছ থেকে আমরা পাই মধু আর মোম। গাছের ডালে বা অন্যান্য জায়গায় যে মৌচাক তোমরা দেখো, সেগুলো কিন্তু আসলে বুনো মৌমাছিদের তৈরি করা চাক। বুনো মৌমাছি বলছি তার কারণ ওই মৌমাছিদের পালন করা হয়নি। ওরা নিজেদের তাগিদেই মৌচাক বানায়। আর সেখানে মধুও তৈরি করে।

মৌচাক

মৌমাছিদের সমাজ

মৌমাছিদের মধ্যে বিভিন্ন কাজ করার জন্য নানাধরনের মৌমাছি দেখা যায়— রানি মৌমাছি, পুরুষ মৌমাছি আর শ্রমিক মৌমাছি। মৌমাছিরা সমাজবদ্ধ জীব। মৌমাছিদের সমাজে তিন ধরনের মৌমাছিদের প্রত্যেকের নির্দিষ্ট কাজ আছে। রানি মৌমাছির কাজ ডিম পাড়া। পুরুষ মৌমাছির কাজ রানি মৌমাছির সঙ্গে প্রজননে অংশ নেওয়া। আর শ্রমিক মৌমাছির কাজ অনেক - মৌচাক তৈরি করা, ফুলের পরাগরেণু আর মকরন্দ সংগ্রহ করা, রানি ও পুরুষ মৌমাছিদের সেবা করা, মধু ও মোম তৈরি করা, সন্তান লালনপালন করা, মৌচাক পাহারা দেওয়া।

শ্রমিক রানি পুরুষ

মৌচাক আর মধু তৈরি

মৌমাছিরা মৌচাক কীভাবে তৈরি করে জানো কি? শ্রমিক মৌমাছিদের পেটের অনেক থলিতে থাকে মোম গ্রন্থি। এই মোম গ্রন্থির ক্ষরণ দিয়ে তারা মৌচাক তৈরি করে। প্রতিটি মৌচাকে অসংখ্য ষড়ভুজাকৃতি প্রকোষ্ঠ থাকে।

আর মৌমাছি মধু কীভাবে তৈরি করে? শ্রমিক মৌমাছিরা ফুল থেকে মকরন্দ সংগ্রহ করে। সংগ্রহ করা মকরন্দ নিজেদের দেহের মধুথলিতে জমা রাখে। মধুথলিতে মকরন্দের সঙ্গে লালারস মেশে। এর ফলে

মকরন্দে থাকা শর্করার কিছু পরিবর্তন হয়। শ্রমিক মৌমাছি এরপর এই মিশ্রণকে মধু প্রকোষ্ঠে উগরে দেয়। আর ডানা দিয়ে ক্রমাগত বাতাস করতে থাকে। ফলে জল বাষ্পীভূত হয়ে মধুতে পরিণত হয়।

মধুর পুষ্টিগুণ

মধুতে প্রচুর গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ থাকায় এটি পুষ্টিকর। এছাড়াও এতে অ্যামাইনো অ্যাসিড ও বিভিন্ন খনিজ পদার্থ (Na, K, Ca, Fe, Mg, P) থাকে। এছাড়াও ভিটামিন A, B-কমপ্লেক্স ও C থাকে।

মৌমাছিরা কীভাবে বেড়ে ওঠে

এসো এবারে চট করে জেনে নেওয়া যাক, মৌমাছিরা কীভাবে ছোটো থেকে বড়ো হয়ে ওঠে। মৌমাছিদের জীবনে চারটে দশা দেখা যায়— ডিম, লার্ভা, পিউপা, পূর্ণাঙ্গ। রানি আর পুরুষ মৌমাছির মিলনের পর রানি মৌমাছি ডিম দেয়। তারপর ডিম থেকে লার্ভা আর লার্ভা থেকে হয় পিউপা। আর পিউপারা পরিণত হয় পূর্ণাঙ্গ মৌমাছিতে।

মৌমাছিদের রকমভেদ

পাহাড়ি মৌমাছি

ভারতীয় মৌমাছি

ছোটো মৌমাছি

ইউরোপীয় মৌমাছি

মৌমাছি পালন

বুনো মৌমাছির চাক থেকে যে মধু পাওয়া যায়, তার পরিমাণ খুবই অল্প। আর সেটা নিয়মিত পাওয়াও যায় না। আর ওই মধুর গুণাগুণও নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। তাই বিজ্ঞানসম্মত ও কৃত্রিম উপায়ে মৌমাছি প্রতিপালন করা হয়। এটাই মৌমাছি পালন বা মৌচাষ। মৌমাছি পালন করার জন্য মৌমাছিদের যে প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম থাকার জায়গা ব্যবহার করা হয়, সেটাই হলো মধুমক্ষীশালা বা এপিয়ারি।

ভারতে মৌমাছি পালনের জন্য দু-ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় — দেশীয় পদ্ধতি আর আধুনিক বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।

দেশীয় পদ্ধতি

i) এই পদ্ধতিতে মৌমাছিদের প্রতিপালন করা হয় না। প্রাকৃতিকভাবে গাছের ডাল, ঘরের দেয়াল বা কার্নিস প্রভৃতি জায়গায় তৈরি হওয়া মৌচাক খুঁজে বার করা হয়।

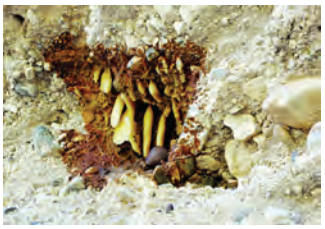

ii) অনেক সময় আবার ফাঁকা কাঠের গুঁড়ি, কাঠের বাক্স বা মাটির হাঁড়ি মৌমাছিদের চলাচলের জায়গায় রেখে দেওয়া হয়। মৌমাছিরা স্বেচ্ছায় এইসব জায়গায় এসে চাক তৈরি করতে পারে।

iii) পরে আগুন, জল বা ধোঁয়া দিয়ে সেই চাক থেকে মৌমাছিদের তাড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ফলে মৌমাছিরা চাক ছেড়ে পালিয়ে যায় আবার কখনও বা মারাও যায়। তারপর সেই মৌচাক ভেঙে মধু বের করে নেওয়া হয়।

আধুনিক পদ্ধতি

i) এই পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক মৌচাক তৈরির কৌশল অবলম্বনে কৃত্রিম মৌচাক তৈরি করা হয়। প্রকৃতিতে স্বাভাবিক উপায়ে তৈরি মৌচাকে নীচের দিকে থাকে মৌমাছিদের সন্তান পালনের ঘর। আর ওপরের দিকে থাকে মধু প্রকোষ্ঠ। এই কৃত্রিম চাকেও সেইরকম ব্যবস্থা করা থাকে।

কৃত্রিম মৌচাক

ii) একটা রানি মৌমাছি আর কতগুলো শ্রমিক মৌমাছিদের ধরে এনে কৃত্রিম মৌচাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা যায় আরও অনেক মৌমাছি ওই মৌচাকে এসে জড়ো হয়েছে।

iii) খুব অল্প সময়ের মধ্যে রানি মৌমাছির ডিম থেকে মৌচাকে প্রচুর মৌমাছির সৃষ্টি হয়।

iv) আম, জাম, লেবু, পেয়ারা, গাজর, ধনে, সরষে, মৌরি, লাউ, কুমড়ো, পেঁয়াজ, মটর ইত্যাদি নানান রকম গাছ থেকে মৌমাছিরা মকরন্দ সংগ্রহ করে। তাই মৌমাছি পালন করতে গেলে মধুমক্ষীশালার কাছাকাছি এইসব গাছ থাকা দরকার।

v) মৌচাক থেকে বিশুদ্ধ মধু সংগ্রহ করার জন্য বিশেষ ধরনের মধু নিষ্কাশন যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

মাছ

মাছ চাষ (Fisheries), কথাটা খুব ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়। মাছ ছাড়াও চিংড়ি, শামুক, ঝিনুক, ব্যাঙ ইত্যাদি প্রাণীদের চাষও মাছ চাষের মধ্যেই পড়ে। আমরা কেবল মাছের চাষ (Pisciculture) নিয়েই আলোচনা করব।

মাছ চাষের প্রকারভেদ

মাছ উৎপাদনের ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী মাছ চাষকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়।

মাছ চাষ (মাছ উৎপাদনের ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী)

সংগ্রহভিত্তিক (Capture)	**পালনভিত্তিক** (Culture)
নদ-নদী ও বিশাল জলাশয়ে মাছ পালন করা সম্ভব হয় না। তাই নদ-নদী ও বিশাল জলাশয়গুলোতে কেবল মাছ ধরা হয়।	পুকুর, খাল, বিল, ডোবা, ভেড়ি প্রভৃতি জলাশয়ে মাছের চারা ছাড়া হয়। নিয়মিত সার প্রয়োগ, খাদ্য সরবরাহ, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য পরিচর্যার মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়।

মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্র অনুযায়ী মাছ চাষকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

মাছ চাষ (মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্র অনুযায়ী)

- **অন্তর্দেশীয়** (Inland)
  - **স্বাদু/ মিঠেজল** (Fresh water)
  - **অল্প লবণাক্ত জল** (Brackish water)
- **সামুদ্রিক** (Marine)
  - **উপকূলীয়** (Coastal)
  - **গভীর সামুদ্রিক** (Deep Sea)

আমরা এখানে মূলত স্বাদু জলে পালনভিত্তিক মাছ চাষ নিয়ে আলোচনা করব।

মাছ চাষ নিয়ে আলোচনা শুরু করার আগে সাধারণত যেসব মাছের চাষ করা হয় তাদের সম্বন্ধে জেনে নিই।

কার্প কী?

মিঠে জলে বাস করা যেসব অস্থিযুক্ত মাছের ত্রিকোণাকৃতি মাথায় আঁশ থাকে না, অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র ও চোয়ালে দাঁত অনুপস্থিত আর দেহের ভেতরে পটকা থাকে— তারাই হলো কার্প। যেমন রুই, কাতলা, বাটা ইত্যাদি মাছ। কার্পকে আবার দু-ভাগে ভাগ করা যায়।

কার্প

- **দেশি কার্প** (Indigenous carp)
  - **মেজর কার্প**
    - i) আকারে বড়ো।
    - ii) তাড়াতাড়ি বাড়ে। সাধারণত বদ্ধ জলে ডিম পাড়ে না।
    - iii) ব্যবসায়িক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ আর চাহিদাও বেশি।
    - উদাহরণ: রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবোস
  - **মাইনর কার্প**
    - i) আকারে ছোটো।
    - ii) তাড়াতাড়ি বাড়ে না। সাধারণত বদ্ধ জলে ডিম পাড়ে।
    - iii) ব্যবসায়িক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ নয়।
    - উদাহরণ: বাটা, পুঁটি ইত্যাদি
- **বহিরাগত কার্প** (Exotic carp)
  - i) বিদেশ থেকে আমদানি করা।
  - ii) ভারতীয় জলবায়ুতে মানিয়ে নিয়ে বেড়ে ওঠে আর প্রজননেও সক্ষম।
  - উদাহরণ: গ্রাস কার্প/ঘেসো রুই, কমন কার্প/আমেরিকান রুই, সিলভার কার্প

রুই

কাতলা

মৃগেল

কালবোস

পুঁটি

কমন কার্প

সিলভার কার্প

গ্রাস কার্প

মাছ চাষের বিভিন্ন পর্যায়

1. ডিম পোনা সংগ্রহ

প্রজনন ঋতুতে অর্থাৎ জুন-জুলাই (আষাঢ়-শ্রাবণ) মাসে রুই, কাতলা, মৃগেলের স্ত্রী মাছগুলো অগভীর জলে ডিম ছাড়ে আর পুরুষ মাছ তার শুক্রাণু নিঃসরণ করে। শুক্রাণু আর ডিম্বাণুর মিলনে ডিম পোনা তৈরি হয়। আর মাছ চাষিরা জাল দিয়ে ছেঁকে ডিম পোনা আর নিষিক্ত ডিমগুলোকে হাঁড়িতে সংগ্রহ করে। নিষিক্ত ডিম কোনগুলো জানো? যেসব ডিমের সঙ্গে শুক্রাণুর মিলন হয়েছে, সেগুলোই হলো নিষিক্ত ডিম। আর এই মিলনের প্রক্রিয়াটাই হলো নিষেক। নিষিক্ত ডিমগুলো থেকেই ডিম পোনা তৈরি হয়।

কৃত্রিম পদ্ধতি

i) কৃত্রিম পদ্ধতিতে ডিমপোনা তৈরি করলে কোন কোন মাছের ডিমপোনা তৈরি হচ্ছে সেটা নিয়ন্ত্রণে থাকে। আর ডিমপোনা সংগ্রহেও অনেক সুবিধা হয়।

ii) এই পদ্ধতিতে প্রতিটা সুস্থ, সবল স্ত্রী মাছের জন্য দুটো সুস্থ, সবল পুরুষ মাছ নেওয়া হয়। মাছের মাথায় মানুষের মতোই একটা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থাকে— এর নাম পিটুইট্যারি গ্রন্থি। মাছের পিটুইট্যারি গ্রন্থির নির্যাস নিয়ে ওই বাছাই করা মাছদের ইনজেকশান দেওয়া হয়। আর পুরুষ ও স্ত্রী মাছের কোনটাকে কখন কতবার কতটা ইনজেকশান দেওয়া হবে তার একটা নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। তোমরা পরে এবিষয়ে বিশদে জানবে।

iii) পিটুইট্যারি ইনজেকশান দেওয়ার ফলে স্ত্রী মাছ ডিম আর পুরুষ মাছ শুক্রাণু নিঃসরণ করে। শুক্রাণু আর ডিম্বাণুর মিলনে ডিম পোনা তৈরি হয়।

2. ডিম পোনা থেকে পূর্ণাঙ্গ মাছ

প্রকৃতি থেকে মাছ চাষীদের সংগ্রহ করা নিষিক্ত ডিমগুলো থেকে ডিম পোনা তৈরি করার জন্য একটা পুকুরে রাখা হয়। এটাই হ্যাচারি। আর ডিম পোনাদের পরপর বেশ কয়েকটা পুকুরে প্রতিপালন করে পূর্ণাঙ্গ মাছ তৈরি করা হয়। এই পুকুরগুলো হলো আঁতুড় পুকুর, পালন পুকুর আর সঞ্চয়ী পুকুর।

ডিম পোনা —(আঁতুড় পুকুর)→ ধানি পোনা —(পালন পুকুর)→ চারা পোনা —(সঞ্চয়ী পুকুর)→ পূর্ণাঙ্গ মাছ

মিশ্র মাছ চাষ

দেশি মাছদের মধ্যে রুই, কাতলা, মৃগেল---এরা পুকুরের জলের বিভিন্ন স্তরে বাস করে আর সেখান থেকেই খাবার সংগ্রহ করে। যেমন কাতলা মাছ ও সিলভার কার্প জলের ওপরের স্তর থেকে, রুই মাছ ও গ্রাস কার্প জলের মাঝের স্তর থেকে আর মৃগেল মাছ ও কমন কার্প জলের নীচের স্তর থেকে খাবার সংগ্রহ করে। তাই এই ধরনের মাছগুলো একসঙ্গে চাষ করলে খাবার ও থাকার জায়গা নিয়ে এদের মধ্যে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় না। ফলে মাছ তাড়াতাড়ি বাড়ে। এই পদ্ধতিতে অনেক সময় একই পুকুরে কেবল রুই, কাতলা আর মৃগেল মাছের চাষ করা হয়। আবার অনেক সময়ে দেশি আর বহিরাগত এই দু রকম মাছের চাষ একই পুকুরে করা

হয়। এই দুটো ক্ষেত্রেই দেখা যায় মাছের উৎপাদন অনেকটাই বেড়ে গেছে। তিন ধরনের দেশি মাছ একই পুকুরে চাষ করাটাই হলো মিশ্র মাছ চাষ। আর তিনধরনের দেশি কার্পের সঙ্গে তিনধরনের বহিরাগত কার্প একই পুকুরে চাষ করাটাই হলো নিবিড় মিশ্র চাষ বা পলিকালচার।

ময়লা জলে মাছ চাষ

আগে জানা দরকার ময়লা জল বলতে কী বোঝানো হচ্ছে। ঘরবাড়ি, পৌরসভা ও কলকারখানার বর্জ্যপদার্থ মেশানো সাধারণত কালো রঙের জল — একেই বলা হয় ময়লা জল। এই জলে মল-মূত্রও মিশে থাকে। আর থাকে কঠিন পদার্থরূপে বিভিন্ন জৈব ও অজৈব পদার্থ।

ময়লা জলে থাকা বিভিন্ন অজৈব পদার্থ, অজৈব সারের মতো কাজ করে। ফলে জলে নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তাই মাছের প্রাথমিক খাবার, ফাইটোপ্ল্যাংকটন প্রচুর পরিমাণে তৈরি হয়। আর এরই ফলে তৈরি হয় জুপ্ল্যাংকটন ও অন্যান্য পোকামাকড়ও। এরাও মাছের খাবার। তাই বাইরে থেকে কৃত্রিম খাবার দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

তবে এক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে মাছ চাষের পুকুরে সরাসরি অপরিশোধিত ময়লা জল ব্যবহার করলে মাছের ক্ষতি হয়। তাই মাছ চাষের পুকুরে সরাসরি ব্যবহারের আগে ময়লা জল পরিশোধন করে নেওয়া জরুরি।

পূর্ব কলকাতার ভেড়িগুলো এই ময়লা জলে মাছ চাষের অন্যতম কেন্দ্র। বিভিন্ন ক্যানাল বা নালার সাহায্যে কলকাতার ময়লা জল নিয়ে ওই অঞ্চলের ভেড়িগুলোতে সরবরাহ করা হয়। তারপর ওই জলে মাছ চাষ করা হয়।

মাছের পুষ্টিগুণ

প্রাণিজ প্রোটিন, অপরিহার্য অ্যামিনো অ্যাসিড ও ফ্যাটি অ্যাসিড সরবরাহে মাছের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তাছাড়াও বিভিন্ন খনিজ পদার্থ (Ca, P, Na, K, Mg, S) ও কিছু ভিটামিন (A, C, D ও B-কমপ্লেক্স) থাকে।

পোলট্রি

হাঁস আর মুরগীর মতো পাখিদের পালন করা হয় আর্থিক লাভের জন্য। কারণ এদের ডিম আর মাংসের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে এমন পাখিরাই হলো পোলট্রি পাখি। আমরা এখানে কেবল মুরগি পালন সম্বন্ধে জানব। অর্থনৈতিক উপযোগিতার ভিত্তিতে মুরগিদের তিনটে ভাগে ভাগ করা হয়।

মুরগি (অর্থনৈতিক উপযোগিতার ভিত্তিতে)

ডিম উৎপাদনকারী জাত (Laying breed)	মাংস উৎপাদনকারী জাত (Table breed)	উভগুণ সম্পন্ন জাত (Dual breed)
এরা বছরে 150-200 বা তারও বেশি ডিম পাড়ে। তাই ডিমের জন্যই এদের পালন করা হয়। উদাহরণ: লেগহর্ন, মিনরকা	এরা বছরে অধিক পরিমাণে মাংস উৎপন্ন করে। তাই শুধু মাংসের জন্য এদের পালন করা হয়। উদাহরণ: আসিল,চিটাগং, ব্রামা, কোচিন	এই ধরনের মুরগিদের থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ডিম আর মাংস পাওয়া যায়। ডিম আর মাংস দুটোই পাওয়ার জন্য এদের পালন করা হয়। উদাহরণ: রোড আইল্যান্ড রেড, প্লাইমাউথ রক, নিউ হ্যাম্পশায়ার

ওজন অনুসারেও মুরগিদের দুটি ভাগে ভাগ করা যায়।

মুরগি (ওজন অনুসারে)

হালকা জাত (Light Breed)
যেসব মুরগির ওজন 2-3 কিলোগ্রামের মধ্যে থাকে। উদাহরণ: লেগহর্ন

ভারী জাত (Heavy Breed)
যেসব মুরগির ওজন 3 কিলোগ্রামের বেশি হয়। উদাহরণ: আসিল, ব্রামা, প্লাইমাউথ রক

ডিমে তা দেওয়ার প্রকৃতি অনুযায়ীও মুরগিদের দুটি ভাগে ভাগ করা যায়।

মুরগি (ডিমে তা দেওয়ার প্রকৃতি অনুসারে)

সিটার (Sitter)
যেসব মুরগি ডিমে তা দেয়
উদাহরণ: ব্রামা, কোচিন

নন-সিটার (Non-Sitter)
যেসব মুরগি ডিমে তা দেয় না
উদাহরণ: লেগহর্ন

মুরগি পালন

আমরা এখানে মুরগি পালনের দুটো আধুনিক পদ্ধতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে জানব।

1. ব্যাটারি খাঁচায় মুরগি পালন পদ্ধতি

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মুরগি পালনের এটা একটা উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে প্রতিটা মুরগির জন্য আলাদা আলাদা খাঁচার ব্যবস্থা করা হয়। খাঁচাগুলো এমন হয় যে খাঁচার অল্প জায়গার মধ্যে একটা মুরগি স্বচ্ছন্দে বসতে বা দাঁড়াতে পারে। এরকম অনেকগুলো খাঁচা সারিবদ্ধভাবে থাকে। খাঁচার মেঝে পেছন থেকে সামনের দিকে ঢালু থাকে। খাঁচার মেঝে ঢালু থাকায় মুরগি ডিম পাড়লে তা সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়ে এসে খাঁচার বাইরের দিকে বেরিয়ে থাকা খাঁজে জমা হয়। খাঁচার বাইরের দিকে খাবার আর জলের পাত্র লাগানো থাকে। আর খাঁচার নীচে মুরগিদের মল সংগ্রহের পাত্র থাকে।

ব্যাটারি খাঁচার মধ্যে মুরগিরা বেশি নড়াচড়া করতে পারে না। তাই শক্তি খরচ হয় কম। তাই এরা যা খায় তার বেশির ভাগটাই দেহগঠন আর ডিম তৈরিতে কাজে লাগে।

2. ডিপ-লিটার পদ্ধতি

লিটার তৈরির ঘর আলো বাতাস যুক্ত হওয়া দরকার। ঘরের মেঝেতে লিটার তৈরির আগে চুন আর ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে জীবাণুমুক্ত করা হয়। এরপর এই পরিষ্কার আর শুকনো মেঝেতে লিটার বিছানো হয়। এবার তাহলে জেনে নেওয়া যাক, লিটার কী? বিচালি (ছোটো ছোটো করে কাটা খড়), কাঠের গুঁড়ো, শুকনো পাতা, ধান, তুলোবীজ আর যবের তুষ, ভুট্টা, আমের খোসা ইত্যাদি

দিয়ে ঘরের মেঝেতে জীবের জন্য শয্যা তৈরি করা হয়। এটাই লিটার। প্রথমে কাঠের গুঁড়ো ছড়িয়ে তার ওপর খড় বিছানো হয়। এরপর অন্যান্য জিনিসগুলো বিছিয়ে 10-15 সেন্টিমিটার পুরু নতুন লিটার তৈরি করা হয়। মুরগিরা থাকতে আরম্ভ করলে ওই লিটারে মুরগির মল ভালোভাবে মিশে গেলে পুরোনো লিটারের ওপরে আবার নতুন করে 5 সেন্টিমিটার পুরু লিটার পাতা হয়। এর ফলে মোটামুটি 20 সেন্টিমিটার পুরু স্থায়ী লিটার তৈরি সম্পূর্ণ হয়।

ডিপ-লিটার ঘরের দেয়ালের বাইরে খাবার আর জলের পাত্র এমনভাবে রাখা হয়, যাতে মুরগি ঘরের ভেতর থেকে শিকের ফাঁক দিয়ে মাথা গলিয়ে খাবার আর জল খেতে পারে। এই ঘরের দেয়ালে আবার ডিম পাড়ার জন্য বাসা বসানো থাকে। মুরগিরা ওই বাসায় গিয়ে ডিম পাড়ে।

মুরগির মাংস ও ডিমের পুষ্টিগুণ

মুরগির মাংস আর ডিম প্রাণীজ প্রোটিনের এক গুরুত্বপূর্ণ উৎস। মুরগির মাংসে ক্ষতিকারক ফ্যাটের পরিমাণ অন্যান্য মাংসের তুলনায় কম থাকায় এটি স্বাস্থ্যকর। মুরগির ডিম অপরিহার্য অ্যামিনো অ্যাসিডের জোগান দেয় । ডিম বিভিন্ন মৌলের ((Fe, Ca, P, K) ও ভিটামিনের (A, B-কমপ্লেক্স, D ও E) চাহিদা মেটায়।

ব্রয়লার

ব্রয়লার হলো একধরনের সংকর মুরগি। শুধুমাত্র মাংস পাওয়ার জন্য এদের সৃষ্টি করা হয়েছে। সংকর জাতের মুরগি তৈরি করার প্রথম চেষ্টা সম্ভবত হয় 1930 সালে। কর্নিশ জাতের একটা পুরুষ মুরগির সঙ্গে সাদা প্লাইমাউথ জাতের একটা স্ত্রী মুরগির মিলন ঘটিয়ে সংকর জাতের মুরগি তৈরি করা হয়। এটাই ব্রয়লার জাতের মুরগি।

ব্রয়লার জাতের মুরগি খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। কাজকর্ম বা নড়াচড়া খুব একটা করে না। যা খায়, তার বেশিরভাগটাই নিজের দেহগঠনে কাজে লাগায়। এরা মাত্র 5-7 সপ্তাহের মধ্যে বিক্রি করার মতো ওজনে পৌঁছে যায়। অন্যদিকে স্বাধীনভাবে পালিত মুরগিদের বিক্রি করার মতো ওজনে পৌঁছোতে লাগে 12-16 সপ্তাহ।

ধান, আম বা চায়ের চাষ সম্বন্ধে তোমার কোনো অভিজ্ঞতা থাকলে নীচে লেখো।

তোমার অভিজ্ঞতা

মৌমাছি পালন, মাছ চাষ বা পোলট্রি পাখি পালন সম্বন্ধে তোমার কোনো অভিজ্ঞতা থাকলে নীচে লেখো।

তোমার অভিজ্ঞতা

9 অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি ও বয়ঃসন্ধি

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি

নীচের গল্পগুলি পড়ো। প্রতিটি গল্পে ঘটনাগুলো তোমাদের প্রায় চেনা। এখন সেই চেনা ঘটনাগুলোর কারণ খোঁজার চেষ্টা করো —

গল্প-১

তাপসের আজকাল আয়নায় মুখ দেখা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। সকালে স্কুলে যাওয়ার আগে বেশ পরিপাটি করে চুল আঁচড়ায়। মা একটু বকাবকিই করেন। আয়নার সামনে বেশিক্ষণ দাঁড়ায় বলে। কিন্তু তা বলে তাপস ওর অভ্যাসটি ছাড়ে না। রোজ আয়নায় নিজেকে দেখে। ওর ইদানীং গোঁফের রেখা দেখা যাচ্ছে, গলার স্বরেরও খানিক বদল ঘটেছে। তাপস মাকে বলে, মা ওরকমভাবে বোকো না। দেখছ না, আমি বড়ো হয়ে গেছি।

গল্প-২

আজ ইস্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার দিন । অসিত অন্যদের সঙ্গে দৌড়োবে। বাঁশি বাজতেই সব প্রতিযোগী মাঠের ধারে লাইন বরাবর দাঁড়িয়ে পড়ল। দ্বিতীয় বাঁশি বাজতেই দৌড় শুরু। প্রাণপণে দৌড়ে অসিত যখন দড়ি ছুঁল,দেখল ও প্রথম হয়েছে। অসিত কথা বলতেই পারছিল না। বুকের হৃৎপিণ্ডটা খুব জোরে জোরে ধুকপুক করছিল। ভীষণ হাঁপাচ্ছিল ও। দরদর করে ঘাম ঝরছিল। জিভটাও শুকিয়ে আসছিল। একটুখানি বসতেই আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে গেল।

গল্প-৩

সুজাতা বাবার সঙ্গে সার্কাস দেখতে গিয়েছিল। খুবই ভালো লেগেছিল ওর। তবে দুজন মানুষকে ওর সবচেয়ে ভালো লেগেছিল। একজন খাটো রণি, অন্যজন রণির বন্ধু বিশাল লম্বা টনি। মনে হয় টনি যেন পায়ে রণ-পা পরে আছে। সুজাতা অবাক হয়ে গিয়েছিল। এরকম খাটো আর এরকম লম্বা মানুষও হয়!

গল্প-৪

রাবেয়া মায়ের সঙ্গে মেলায় বেড়াতে গিয়েছিল। ঘুরতে ঘুরতে খুব জল তেষ্টা পেয়েছিল। মাকে বলল সেকথা। তখন তিনি রাবেয়াকে শরবত কিনে দিলেন। দোকানদারকে শরবতে চিনি মেশাতে বারণ করলেন। রাবেয়া মাকে শরবতে চিনি দিতে না বলার জন্য চাপ দিল না। রাবেয়া জানত যে ওর চিনি খাওয়া একদম বারণ। তাই ও একেবারেই মিষ্টি খায় না। আজকাল খুব অল্পেই হাঁপিয়ে যায়। কোথাও কেটে গেলে ঘা যেন শুকোতে চায় না।

গল্প-৫

আজকাল চায়নার খুব ঘুম পায়। সেদিন তো ক্লাসের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। তার জন্য দিদির কাছে খুব বকুনি খেয়েছিল । কী যে হয়েছে চায়নার। গলার সামনেটা উঁচু মতো কী একটা যেন ওঠানামা করছে। খুব ক্লান্তি বোধ করে। পড়াশোনা করতেই ইচ্ছে করে না। সবসময় কেবল ঘুমোতে ইচ্ছে করে।

ছোটোবেলা থেকে বড়ো হবার পথে একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর আমাদের শরীরে নানা পরিবর্তন ঘটে। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে লেখো।

তোমার ছোটোবেলার সঙ্গে তুলনা করে নীচের কাজটি করো —

শরীরের নানা পরিবর্তন	কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছে
1. উচ্চতা	
2. ওজন	
3. কণ্ঠস্বর	
4. পেশির গঠন	

সুতরাং তোমরা দেখলে একটা বয়সের পর তোমার মতোই অনেকের উচ্চতা, ওজন, কণ্ঠস্বরের বেশ পরিবর্তন ঘটেছে। আচ্ছা এবার মনে তো প্রশ্ন উঠতেই পারে যে এই ধরনের নানা শারীরিক পরিবর্তনের কারণ কী? শুধুই কি শরীরের পরিবর্তন ঘটে। মনেরও তো ঘটে, তাই না?

তোমরা এবার নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে লেখো তো মনের কী কী পরিবর্তন ঘটে —

মনের পরিবর্তন	কখন হয়
1. রাগ হওয়া	
2. কান্না পাওয়া	
3. হিংসা করা	
4. ভালো লাগা	
5. অভিমান হওয়া	

জন্মের সময় থেকে শুরু করে মারা যাবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের শরীরে, মনে নানা পরিবর্তন ঘটে। আর এইসব পরিবর্তনের অন্যতম নিয়ন্ত্রক হলো হরমোন। শরীরের বৃদ্ধি, ওজন, হজম প্রক্রিয়া, রোগ প্রতিরোধ, রক্তচাপ, মূত্র উৎপাদন, ঘাম তৈরিতে এমনকি হৃদযন্ত্র ঠিক রাখতে সক্রিয় ভূমিকা নেয় হরমোন। তোমার ভালোলাগা, মন্দলাগা, কান্না, হাসি, সব আবেগকেই অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করে হরমোন।

আসলে হরমোন হলো আমাদের শরীরে রক্তবাহিত কয়েক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ। এরা প্রয়োজন অনুযায়ী এক সেকেন্ডের জন্যও আমাদের শরীরে তৈরি হতে পারে আবার কোনো কোনো হরমোন সারাজীবন ধরেই রক্তে পাওয়া যায়।

আমাদের শরীরের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে দু-ধরনের সংযোগ স্থাপন হয়। পায়ে মশা বসলে মস্তিষ্ক ঠিক খবর পায়। মস্তিষ্ক তখন হাতকে নির্দেশ দেয় মশাকে তাড়ানোর জন্য। হাত তখন মস্তিষ্কের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে। এই ঘটনাটি স্নায়বিক সংযোগস্থাপনের একটি উদাহরণ। আর একটি সংযোগস্থাপন হলো রাসায়নিক। রাসায়নিক বার্তাবাহক হিসাবে রাসায়নিক সংযোগ স্থাপনের কাজটা অনেকটাই করে হরমোন। প্রয়োজনীয় নির্দেশ পেলেই সে নির্দিষ্ট জায়গা থেকে তৈরি হয়ে লক্ষ্যে চলে যায়। যে লক্ষ্যে যায় তার নাম গ্রাহক। হরমোন খুব ধীরে ধীরে কাজ শুরু করে। কিন্তু কাজের প্রভাব থাকে অনেকক্ষণ। কাজ হয়ে গেলে হরমোন নষ্ট হয়ে যায়। রক্তে হরমোনের মাত্রা কমে গেলে প্রয়োজন অনুযায়ী আবার নতুন করে তৈরি হয়। তবে ধারাবাহিকভাবে রক্তে হরমোনের মাত্রা স্বাভাবিকের থেকে বেশি বা কম থাকলে নানারকম সমস্যা দেখা যায়। কোনো কোনো হরমোন আমাদের শরীরে প্রোটিনের ব্যবহার কমিয়ে দেয়। ফ্যাটের ভাঙন বাড়িয়ে দেয়। অব্যবহৃত প্রোটিনকে দেহগঠন ও বৃদ্ধির কাজে লাগায়।

হরমোন কোথা থেকে তৈরি হয়

আমাদের শরীরে বিভিন্ন অঙ্গে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে নানা কোশের গুচ্ছ বা গ্রন্থি। তাদের মধ্যে বেশ কিছু গ্রন্থির আবার পাইপের মতো নালিকা আছে।

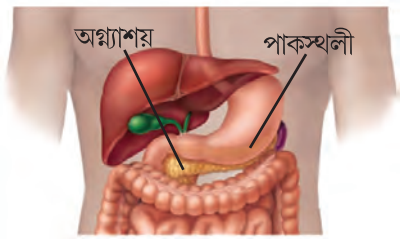

নালিকার মধ্যে দিয়ে গ্রন্থি থেকে বেরোনো রস এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যায়। এই ধরনের গ্রন্থিকে বলে বহিঃক্ষরা গ্রন্থি বা এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ড। যেমন, লালাগ্রন্থি থেকে বেরোনো লালারস, পাকস্থলীর গ্রন্থি থেকে বেরোনো পাকরস, অগ্ন্যাশয় থেকে বেরোনো অগ্ন্যাশয়রস ইত্যাদি। তবে এই রসে নানান এনজাইম বা উৎসেচক থাকে যা খাবারকে ভাঙতে সাহায্য করে।

আবার বেশ কিছু গ্রন্থি আছে যাদের কোনো নালিকা নেই। তাই এইসব গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত রস সরাসরি রক্তে মেশে। রক্তবাহিত হয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায়। এই গ্রন্থি থেকেই ক্ষরিত হয় হরমোন। রক্ত এই হরমোনগুলোকে নির্দিষ্ট ক্রিয়াস্থলে নিয়ে যায়। এইসব গ্রন্থিকে বলে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি বা এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড। যেমন থাইরয়েড গ্রন্থি । তবে আরও একধরনের গ্রন্থি আছে যাদের মধ্যে অন্তঃক্ষরা ও বহিঃক্ষরা দু-ধরনের গ্রন্থিকোশ থাকে। তারা হলো মিশ্র গ্রন্থি। নালিকাবিহীন কোশ থেকে হরমোন বেরোয় আর নালিকাযুক্ত কোশ থেকে বেরোয় উৎসেচক, যা খাবারকে ভাঙতে সাহায্য করে। যেমন অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি।

প্রধান প্রধান অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি ও তাদের কাজ

1. **পিট্যুইটারি গ্রন্থি** — মস্তিষ্কের মূলদেশে দুটি খণ্ড বিশিষ্ট পিট্যুইটারি গ্রন্থি থাকে। ওপরের খণ্ডকে বলে অগ্র পিট্যুইটারি, আর নীচের খণ্ডকে বলে পশ্চাৎ পিট্যুইটারি। পিট্যুইটারির এই দুটি খণ্ড থেকে নানারকম হরমোন ক্ষরণ হয়। যেমন সোমাটোট্রফিক হরমোন, থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন, গোনাডোট্রফিক হরমোন, ভ্যাসোপ্রেসিন ইত্যাদি। এরকম একটা ছোটো গ্রন্থি গোটা শরীরের নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে।

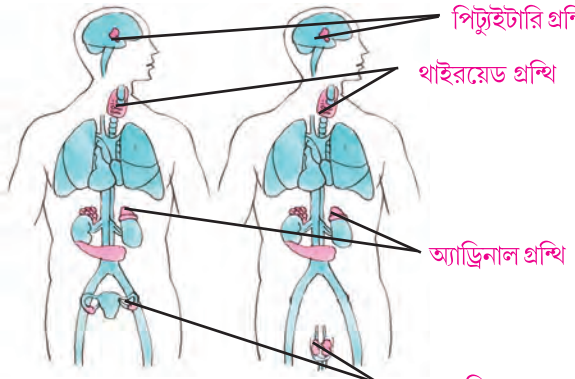

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি যেখানে যেখানে থাকে

● **সোমাটোট্রফিক হরমোন:** এই হরমোনকে বৃদ্ধিপোষক হরমোনও বলে। আমাদের শরীরের বিভিন্ন পেশি ও হাড়গুলির দৈর্ঘ্য বাড়ায়। প্রোটিনের উৎপাদন বাড়ায় আর প্রোটিনের ক্ষয় কমায়।

অল্পবয়সে এই হরমোনের বেশি ক্ষরণ হলে বিপদ আছে। হাড় বেড়ে যায়। উচ্চতা 7-8 ফুট হয়ে যায়। আর কম ক্ষরণ হলেও বিপদ! পরিণত মানুষের উচ্চতা মাত্র তিন ফুটের মতো হয়। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে শিশুদের মতো দেখায়।

এছাড়া আরও কিছু হরমোন ক্ষরণ করে পিট্যুইটারি গ্রন্থি। যা কিনা অন্য অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলিকে উত্তেজিত করে।

● থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন: পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হয়। থাইরয়েড গ্রন্থির বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে থাইরক্সিন হরমোন ক্ষরণে উদ্দীপনা যোগায়। তবে এই হরমোন ক্ষরণ বেশি হলে থাইরয়েড গ্রন্থি ফুলে যায়। ফলে গলা ফুলে ওঠে।

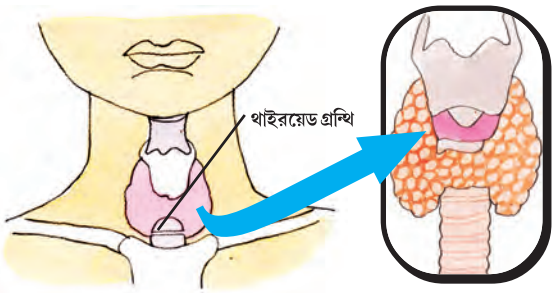

2. থাইরয়েড গ্রন্থি: আমাদের গলার সামনে স্বরযন্ত্র রয়েছে। তার ঠিক নীচে শ্বাসনালির দু-পাশে থাইরয়েড গ্রন্থি থাকে। কারো কারো ক্ষেত্রে ঢোঁক গেলার সময় এটি ওঠানামা করে। এই গ্রন্থির দুটি খণ্ড। এই গ্রন্থি থেকে থাইরক্সিন নামক হরমোন ক্ষরিত হয়।

● **থাইরক্সিন:** এই হরমোন হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন হারকে বাড়াতে সাহায্য করে। এই হরমোন আমাদের শরীরে শক্তি উৎপাদনকে প্রভাবিত করে। আমাদের শরীরের কোশগুলিতে অক্সিজেনের ব্যবহারকে বাড়িয়ে দেয়। দেহের হাড় ও পেশিকে বাড়াতে সাহায্য করে।

এই হরমোন বেশি ক্ষরণে থাইরয়েড গ্রন্থি ফুলে ওঠে, কিছু ক্ষেত্রে মনে হয় যেন চোখ দুটো ঠেলে বাইরে চলে আসছে। রক্তচাপের তারতম্য হয়।
আবার কম ক্ষরণ হলে শিশুর বাড় কমে যায়, পেট ফোলা হয়, পেশি দুর্বল হয়। জিভ বেরিয়ে থাকে। মুখ থেকে লালা গড়ায়। বড়োদের শরীরে এই হরমোনের কম ক্ষরণে শরীরের চামড়া ফোলা ফোলা ও খসখসে হয়।

3. অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি: পাকস্থলীর নীচে ক্ষুদ্রান্ত্রের ডিওডেনামের 'U' আকৃতির বাঁক থেকে প্লীহা পর্যন্ত রয়েছে অগ্ন্যাশয়। আমরা আগেই জেনেছি অগ্ন্যাশয় হলো মিশ্র গ্রন্থি। এই গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হয় ইনসুলিন ও গ্লুকাগন নামক হরমোন।

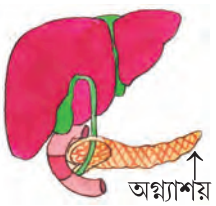

● **ইনসুলিন:** অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি ক্ষরিত এই হরমোন রক্তের সাহায্যে গ্লুকোজকে কোশে ঢুকতে সাহায্য করে। গ্লুকোজের ভাঙন ঘটিয়ে শক্তি উৎপাদনে সাহায্য করে। আবার গ্লুকোজকে যকৃৎ ও পেশিতে গ্লাইকোজেনরূপে সঞ্চয় করে রাখতে সাহায্য করে। আবার কখনো -কখনো প্রোটিন, ফ্যাট থেকে গ্লুকোজ উৎপাদনে বাধা দেয়। ফলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা ঠিক থাকে, ডায়াবেটিস রোগের সম্ভাবনা কমে। তাই একে অ্যান্টিডায়াবেটিক হরমোন বলা হয়।

এই হরমোনের কম ক্ষরণে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায়। ফলে মূত্রের সঙ্গে গ্লুকোজ দেহ থেকে বাইরে বেরিয়ে যায়। কোশে প্রয়োজনীয় গ্লুকোজ ঢুকতে পারে না। বারেবারে খিদে পায়। শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ে। রক্তে চিনির পরিমাণ বেড়ে থাকার জন্য রোগজীবাণুর সংক্রমণ বাড়ে। হৃৎপিণ্ড, বৃক্ক ও চোখের কার্যক্ষমতা কমে যায়।

4. অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি: আমাদের প্রতিটি বৃক্ক বা কিডনির উপর ত্রিভুজের মতো একজোড়া গ্রন্থি আছে। বামদিকের গ্রন্থিটি আকারে বড়ো। ডানদিকেরটা ছোটো। বৃক্কের ওপরে টুপির মতো বসানো। এই গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত অ্যাড্রিনালিন হরমোন দেহের নানা জরুরি অবস্থায় ক্ষরিত হয়। জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য দেহকে প্রস্তুত করে। তাই এই হরমোনকে আপৎকালীন হরমোন বলে।

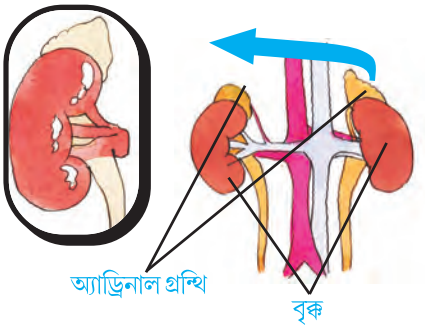

● **অ্যাড্রিনালিন হরমোন:** অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি থেকে অ্যাড্রিনালিন হরমোন ক্ষরিত হয়। এই হরমোন আমাদের শরীরে শ্বাসকার্যের হারকে বাড়ায়। আমাদের শরীরের তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে। হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণ ক্ষমতা বাড়ায়। মূত্র উৎপাদনকেও নিয়ন্ত্রণ করে। বিশেষ করে আমাদের বিভিন্ন মানসিক অবস্থা অর্থাৎ ভয়, দ্বন্দ্ব ও পালানোর মনোবৃত্তিকে অ্যাড্রিনালিন হরমোন জরুরি ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রণ করে।

তবে এই হরমোনের অধিক ক্ষরণে মুখমণ্ডল গোলাকার হয় ও ফুলে যায়। এজন্য এই ধরনের মুখকে বলে মুন ফেস। মুখের ত্বক খসখসে আর ফ্যাকাশে হয়। মহিলাদের মুখমণ্ডলে লোমের আধিক্য দেখা যায়। ক্ষত সারতেও সময় লাগে। কম ক্ষরণে হজমের গণ্ডগোল, পেশির দুর্বলতা ইত্যাদি উপসর্গ তৈরি হয়।

দৌড়োনোর সময় আমাদের শরীরে কী কী পরিবর্তন ঘটে তা দলে মিলে আলোচনা করে লেখো ।

চোখ/মুখ	শরীরের ত্বক	মাংসপেশি	হৃৎপিণ্ড

অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত অ্যাড্রিনালিন হলো জরুরিকালীন হরমোন বা সংকটকালীন হরমোন। দৌড়োনোর সময় খুব শক্তি দরকার হয়। অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত অ্যাড্রিনালিন সেই বাড়তি শক্তি জোগাতে সাহায্য করে।

5. জনন গ্রন্থি: ছেলে এবং মেয়েদের শরীরে ভিন্ন ধরনের জনন গ্রন্থি থাকে। মেয়েদের শরীরে এই জনন গ্রন্থির নাম হলো ডিম্বাশয়। আর এখান থেকেই ক্ষরিত হয় ইস্ট্রোজেন, প্রজেস্টেরন। আর ছেলেদের শরীরে এই জনন গ্রন্থির নাম হলো শুক্রাশয়। এখান থেকে ক্ষরিত হয় টেস্টোস্টেরন নামক হরমোন। ইস্ট্রোজেন ও টেস্টোস্টেরন ছেলে ও মেয়েদের দেহে একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর সক্রিয় হয়। ফলে জননতন্ত্রে ও শরীরের অন্যান্য অঙ্গের গঠনে নানা পরিবর্তন চোখে পড়ে।

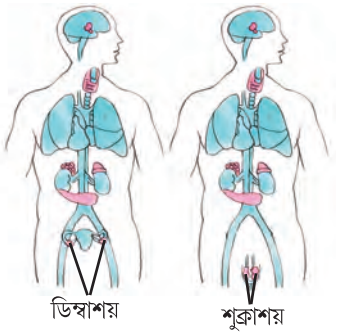

● **টেস্টোস্টেরন**: এই হরমোনের প্রভাবে বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেদের গোঁফ, দাড়ি বের হয়। ধীরে ধীরে হাড় ও পেশি শক্তিশালী হয়। পেশিবহুল চেহারা তৈরি হয়। গলার স্বরে ভাঙন ঘটে। গলার স্বর ভারী হয়।

● **ইস্ট্রোজেন**: স্ত্রীদেহে ক্ষরিত হয়। হাড় ও পেশির বৃদ্ধি ঘটিয়ে দেহের সম্পূর্ণ বৃদ্ধি ঘটায়। ত্বকের নীচে ফ্যাটজাতীয় পদার্থের সঞ্চয় ঘটিয়ে শরীরে বদল আনে। পুরুষের শরীরেও ইস্ট্রোজেন পাওয়া যায়। তবে স্ত্রীদেহের চেয়ে কম পরিমাণে। স্ত্রীদেহেও টেস্টোস্টেরন পাওয়া যায়। তবে পুরুষের চেয়ে কম পরিমাণে।

প্রথম পাতার গল্পগুলি আবার ভালো করে পড়ো। তারপর নীচের তালিকাটি পূরণ করো—

গল্প নম্বর	যে হরমোনের কম/ বেশি ক্ষরণের ফলে ঘটনাটি ঘটে

নীচের উপসর্গগুলি কোন কোন হরমোনের কারণে ঘটে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো—

উপসর্গ	দায়ী হরমোনের নাম
গ্রন্থি ফুলে ওঠে, চোখ দুটো যেন ঠেলে বাইরে চলে আসে। দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায়।	
দেহের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হয়। হাড় বেড়ে যায়।	
রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায়। মূত্রের সঙ্গে গ্লুকোজ বেরোয়। বারেবারে খিদে পায়। শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ে।	
মুখমণ্ডল ফুলে গোলাকার হয়ে যায়। মুখের ত্বক খসখসে আর ফ্যাকাশে হয়। ক্ষত সারতেও সময় লাগে।	

বয়ঃসন্ধি

ফটিকের কথা -১

কলিকাতায় মামার বাড়ি পৌঁছাইয়া প্রথমত মামির সঙ্গে আলাপ হইল। মামি এই অনাবশ্যক পরিবার বৃদ্ধিতে মনে মনে যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার নিজের তিনটি ছেলে লইয়া তিনি নিজের নিয়মে ঘরকন্না পাতিয়া বসিয়া আছেন, ইহার মধ্যে সহসা একটি তেরো বৎসরের অপরিচিত অশিক্ষিত পাড়াগেঁয়ে ছেলে ছাড়িয়া দিলে কিরূপ একটা বিপ্লবের সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। বিশ্বম্ভরের এত বয়েস হইল, তবু কিছুমাত্র যদি জ্ঞানকাণ্ড আছে।

বিশেষত, তেরো-চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মতো পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোনো কাজেও লাগে না। স্নেহও উদ্রেক করে না, তাহার সঙ্গসুখও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধো-আধো কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথামাত্রই প্রগলভতা। হঠাৎ কাপড়চোপড়ের পরিমাণ রক্ষা না করিয়া বেমানানরূপে বাড়িয়া উঠে; লোকে সেটা তাহার একটা কুশ্রী স্পর্ধাস্বরূপ জ্ঞান করে। তাহার শৈশবের লালিত্য এবং কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা সহসা চলিয়া যায়, লোকে সেজন্য তাহাকে মনে মনে অপরাধ না দিয়া থাকিতে পারে না। শৈশব এবং যৌবনের অনেক দোষ মাপ করা যায়, কিন্তু এই সময়ের কোনো স্বাভাবিক অনিবার্য ত্রুটিও যেন অসহ্য বোধ হয়।

সেও সর্বদা মনে মনে বুঝিতে পারে, পৃথিবীর কোথাও সে ঠিক খাপ খাইতেছে না; এইজন্য আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্বদা লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া থাকে। অথচ এই বয়সেই স্নেহের জন্য কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত কাতরতা মনে জন্মায়। এই সময়ে যদি সে কোনো সহৃদয় ব্যক্তির নিকট হইতে স্নেহ কিংবা সখ্য লাভ করিতে পারে, তবে তাহার নিকট আত্মবিক্রিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাকে স্নেহ করিতে কেহ সাহস করে না, কারণ সেটা সাধারণে প্রশ্রয় বলিয়া মনে করে। সুতরাং তাহার চেহারা এবং ভাবখানা অনেকটা প্রভুহীন পথের কুকুরের মতো হইয়া যায়।

অতএব, এমন অবস্থায় মাতৃভবন ছাড়া আর কোনো অপরিচিত স্থান বালকের পক্ষে নরক। চারিদিকের স্নেহশূন্য বিরাগ তাহাকে পদে পদে কাঁটার মতো বিঁধে। এই বয়সে সাধারণত নারীজাতিকে কোনো এক শ্রেষ্ঠ স্বর্গলোকের দুর্লভ জীব বলিয়া মনে ধারণা হইতে আরম্ভ হয়, অতএব তাঁহাদের নিকট হইতে উপেক্ষা অত্যন্ত দুঃসহ বোধ হয়।

এটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছুটি' গল্পের একটি অংশ। গল্পে ফটিকের বয়স ছিল তেরো-চোদ্দ বছর । অর্থাৎ তোমাদেরই মতো। তারপর ছোটোবেলা থেকে বড়ো হবার পথে ফটিকের মতো তোমাদের কী কী পরিবর্তন হয়েছে তা দলে মিলে আলোচনা করে লেখো।

শরীরের পরিবর্তন	মনের পরিবর্তন

ফটিকের কথা -২

স্কুলে এতবড়ো নির্বোধ এবং অমনোযোগী বালক আর ছিল না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত। মাস্টার যখন মার আরম্ভ করিত তখন ভারাক্রান্ত গর্দভের মতো নীরবে সহ্য করিত। ছেলেদের যখন খেলিবার ছুটি হইত, তখন জানালার কাছে দাঁড়াইয়া দূরের বাড়িগুলোর ছাদ নিরীক্ষণ করিত; যখন সেই দ্বিপ্রহর রৌদ্রে কোনো একটা ছাদে দুটি-একটি ছেলেমেয়ে কিছু একটা খেলার ছলে ক্ষণেকের জন্য দেখা দিয়া যাইত, তখন তাহার চিত্ত অধীর হইয়া উঠিত।

একদিন অনেক প্রতিজ্ঞা করিয়া অনেক সাহসে মামাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, মামা, মার কাছে যাব। মামা বলিয়াছিলেন, স্কুলের ছুটি হোক। কার্তিক মাসে পূজার ছুটি, সে এখনও ঢের দেরি।

একদিন ফটিক তাহার স্কুলের বই হারাইয়া ফেলিল। একে তো সহজেই পড়া তৈরি হয় না, তাহার পর বই হারাইয়া একেবারে নাচার হইয়া পড়িল। মাস্টার প্রতিদিন তাহাকে অত্যন্ত মারধোর অপমান করিতে আরম্ভ করিলেন। স্কুলে তাহার এমন অবস্থা হইল যে, তাহার মামাতো ভাইরা তাহার সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করিত। ইহার কোনো অপমানে তাহারা অন্যান্য বালকের চেয়েও যেন বলপূর্বক বেশি করিয়া আমোদ প্রকাশ করিত।

অসহ্য বোধ হওয়াতে একদিন ফটিক তাহার মামির কাছে নিতান্ত অপরাধীর মতো গিয়া কহিল, বই হারিয়ে ফেলেছি।

মামি অধরের দুই প্রান্তে বিরক্তির রেখা অঙ্কিত করিয়া বলিলেন, বেশ করেছ, আমি তোমাকে মাসের মধ্যে পাঁচবার করে বই কিনে দিতে পারিনে।

ফটিক আর কিছু না বলিয়া চলিয়া আসিল—সে যে পরের পয়সা নষ্ট করিতেছে, এই মনে করিয়া তাহার মায়ের উপর অত্যন্ত অভিমান উপস্থিত হইল; নিজের হীনতা এবং দৈন্য তাহাকে মাটির সহিত মিশাইয়া ফেলিল।

দেখছো তো ওই 'ছুটি' গল্পেই রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন ফটিক যা কিছু করুক না কেন সে মনে করত, সব ভুল করছে। নিজেকে ভীষণ হীন মনে করত। আচ্ছা, তোমাদের স্কুলে যদি ফটিকের মতো কোনো বন্ধুকে পেতে তাহলে তোমরা তাকে কীভাবে সাহায্য করতে?

ফটিকের যেমন খেলতে ভালো লাগত, ঘরের নানারকম কাজ করতে ভালো লাগত, সেরকম তোমাদেরও তো নানারকম কাজ করতে ভালো লাগে। তোমার কী কী কাজ করতে ভালো লাগে?

তোমার কোনো কাজের প্রশংসা পেলে কেমন লাগে?

কাজ করার পর কেউ নিন্দা করলে কী মনে হয়?

তোমার ছোটোবেলাতেও কী এরকম মনে হতো?

তোমার ছোটোবেলা থেকে এখন পর্যন্ত তোমার মধ্যে কী কী পরিবর্তন লক্ষ করেছ?

শরীরের দ্রুত পরিবর্তন

শৈশব থেকে যৌবনের সময়কালকে বলে কৈশোর। কৈশোরকে বয়ঃসন্ধিও বলে। WHO (World Health Organization) বয়ঃসন্ধিকাল হিসাবে 10 থেকে 19 বছর পর্যন্ত বয়সকে নির্ধারিত করেছে। এই সময় শরীর ও মনের দ্রুত পরিবর্তন হয়। তুমি নিশ্চয়ই সেটা লক্ষ করেছ তোমার মধ্যে। আমাদের শরীরে বেশ কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যেমন আমাদের উচ্চতা, ওজন, এমনকি শরীরের গঠনেরও পরিবর্তন ঘটে। মানুষের মধ্যেই এই পরিবর্তন ঘটে। তবে বিশেষ কিছু অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি এবং হরমোন এই পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে নীচের কাজটি করো।

1. কোন কোন হরমোন বয়ঃসন্ধিকালীন সময়ে শরীরে দ্রুত পরিবর্তনে সাহায্য করে?
2. কোন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে এই হরমোনগুলো ক্ষরিত হয়?

বয়ঃসন্ধিতে মনের পরিবর্তন

বয়ঃসন্ধি পর্বে ছেলেমেয়েদের শরীরে যেমন নানা পরিবর্তন দেখা যায়, তেমনই মনে এবং পারস্পরিক সম্পর্কেও পরিবর্তন দেখা যায়। শরীরের পরিবর্তন চোখে দেখা যায়। কিন্তু মনের?

রাজু আর শুভ দুজনেই ভালো বন্ধু। রাজুর বাবা অন্য জায়গায় বদলি হয়ে গিয়েছিলেন। তাই রাজুকেও যেতে হয়েছিল। অনেকদিন পর সেই রাজুর সঙ্গে দেখা। শুভ দেখল রাজু আগের মতো নেই। শুভ জিজ্ঞাসা করল— স্কুল কেমন চলছে। রাজু বলল- স্কুলের নাটকের দলে একটা গুরুত্বপূর্ণ রোল পেয়েছিলাম। মনে হয় আমি রোগা আর গলার স্বর ভেঙে গেছে বলে দু-দিন আগে আমাকে বাদ দিয়ে দিয়েছে।

শুভ নিজের অবস্থার কথাটা একবার ভাবল। ওর উচ্চতা নিয়ে দুশ্চিন্তাটা আবার ঘুরে ফিরে এল। শুভ জানে ওর ক্লাসে ওর চেয়ে সবাই বেশ লম্বা আর রোগা, তাহলে ও কি স্বাভাবিক? ওর কি ওজন বাড়ছে?

টুম্পা আর রুমা খুব ভালো বন্ধু। অনেকদিন পর দেখা। টুম্পাকে বেশ মনমরা দেখাচ্ছিল। রুমা জিজ্ঞাসা করল- কীরে, ভালো আছিস তো? টুম্পা বলল- নারে, মনটা ভালো নেই। মুখে খুব ব্রণ বেরিয়েছে। কি বিচ্ছিরি লাগছে না আর সবার থেকে?

রুমা বলল— টুম্পা একদম মন খারাপ করিস না। আমাদের বয়সে ব্রণ অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। একটা বয়সের পর থেকে আমাদের মুখমণ্ডলের ত্বকের লোমকূপগুলোতে বেশি পরিমাণ সিবাম জমে গেলে ব্রণ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই সময় আমরা যদি শরীরের ঠিকঠাক যত্ন নিই তাহলে ব্রণ হলেও তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাবে। তাই, তুই মন খারাপ করিস না। আমরা সবাই তো আর একরকম নই। আমরা প্রত্যেকেই স্বাভাবিক ও সুন্দর।

একটা খরগোশের গল্প

এক খরগোশের একটা কান ঝোলা ছিল। তাই দেখে অন্য খরগোশেরা ওকে রাগাত। এতে সে রেগে গিয়ে কান খাড়া করার জন্য নানা কসরত করতে লাগল। পিছনের পা গাছের ডালে আটকে ঝুলতে লাগল। যাতে তার ঝোলা কান সোজা হয়ে যায়। এমন সময় একটা বিড়াল গাছের তলা দিয়ে যাচ্ছিল। খরগোশের ওই অবস্থা দেখে ব্যাপারটা সম্বন্ধে জানার চেষ্টা করল। বিড়াল বলল - তাতে কী হয়েছে? তোমার কান ছোটো বলে তুমি অন্য খরগোশদের থেকে ছোটো হয়ে গেছ? ওরা যদি খাড়া কান নিয়ে স্বাভাবিক হয়, তুমি ঝোলা কান নিয়ে স্বাভাবিক। তোমার তো তাতে কোনো অসুবিধা নেই। খরগোশ নিজের ভুল বুঝতে পারল। সে দৌড়ে গিয়ে অন্য খরগোশদের একথা বলল। অন্যরাও তখন ওকে নিয়ে হাসিঠাট্টা বন্ধ করল।

আগের পাতার গল্পদুটো ভালো করে পড়ো। তারপর বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে নীচের কাজটা করো—

1. কোন কোন গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত কোন কোন হরমোন রাজু, শুভ ও টুম্পার এই অবস্থার জন্য দায়ী?
2. রাজু আর শুভ তাদের অবস্থার উন্নতি কীভাবে ঘটাতে পারবে বলে মনে করো?
3. টুম্পা তার অবস্থার উন্নতির জন্য কী করতে পারে?
4. তোমরা বন্ধুদের কোন গুণটাকে বড়ো করে দেখতে চাও? বন্ধুত্বে চেহারার গড়নের কি কোনো গুরুত্ব আছে?

বয়ঃসন্ধিতে আচরণের সমস্যা

রতন রোজ স্কুলে যাওয়ার নাম করে বেরোয়। কিন্তু স্কুলে আসে না, প্রায় দিনই কামাই। যদিও বা কোনোদিন আসে, সেদিন তো মহা বিপত্তি। বন্ধুদের সঙ্গে মারপিট, বন্ধুদের বই লুকিয়ে ফেলা, মুখে মুখে তর্ক করা এসব অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। কারণে অকারণে মিথ্যা বলাটাও কোনো ব্যাপার নয়। বাড়িতেও এক অবস্থা, বাবা- মার সঙ্গে তর্ক করে। রেগে গিয়ে একবার একটা কাচের গ্লাস ভেঙে দিয়েছিল।

মহুয়া যখনই হাত ধুতে যায় বারবার করে হাত ধোয়। ওর মনে হয় হাতটা বোধহয় ঠিকমতো পরিষ্কার হলো না। তাই সে আবার ধোয়। অঙ্ক ক্লাসে তো লাইন টানতে গিয়ে বারবার করে মুছতে থাকে। আর দেখে লাইনটা সোজা হলো কিনা। একদিন তো ঘরে তালা লাগাতে গিয়ে ঘেমে অস্থির। বারেবারে তালায় চাবি লাগিয়ে আবার খুলে ফেলছে। ভাবছে বোধহয় তালাটা লাগেনি।

সুমন পড়াশোনায় ভালোই। বেশ শান্ত প্রকৃতির ছেলে। কম কথা বলে। পাড়াতে অন্য বন্ধুদের সঙ্গে খুব একটা মিশত না। একা একা থাকতে বেশি ভালোবাসত। ইদানীং দেখা যাচ্ছে ও নিজের মনে কীসব যেন বিড়বিড় করে বকছে। একদিন তো ওর ক্লাসের এক সহপাঠীকে দুম করে মেরেই বসল ও। ভেবেছিল বন্ধুটি নাকি ওর ক্ষতি করবে। ও ভাবল ঠিকই করেছে মারপিট করে। ক্লাসের বন্ধুদের সন্দেহ করতে শুরু করল। খালি নিজের মনে বিড়বিড় করে। মনে হয় যেন কারোর সঙ্গে কথা বলছে। চুল উসকোখুসকো, স্নান-খাওয়াটাও ঠিকমতো করত না। শেষে স্কুলে আসাও বন্ধ করে দিল।

কারোর কারোর আচরণ অন্যদের চোখে সমস্যা হিসাবে ধরা পড়ে। কিছু আচরণ অন্যের ক্ষতিও ডেকে আনে। কিন্তু তার জন্যে তাদের মনে অনুতাপ হয় না। নিজেও কোনো কষ্ট অনুভব করে না। ক্ষতিকর পরিণতির কথা জানা থাকলেও একই আচরণ বারবার করতে থাকে।

এবিষয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করো। তারপর দলে মিলে নীচের কাজটা করো।

তেরো-চোদ্দ বছর বয়সে কী কী ধরনের আচরণের সমস্যা দেখা যায়?

1. একটুতেই রেগে যাওয়া
2. অকারণে কেঁদে ফেলা
3.
4.
5.
6.
7.

তোমার মতে, এই ধরনের সমস্যা থাকলে কী করা দরকার ?

ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ

আলি ফুটবল খেলার ফাইনালের আগে প্রচুর বাজি কিনেছে। তার মধ্যে শব্দবাজিও আছে। যদিও এগুলো ও লুকিয়ে কিনেছে। দল জিতে যাওয়ায় বাজিগুলো পকেটে পুরে খুব নাচছিল আলি। মাঝে মধ্যে একটা দুটো বের করে ফাটাচ্ছিল। কিছু বাজি ফাটছিল না। সেগুলো তুলে আবার ফাটাচ্ছিল। হয়তো ওই পোড়া বাজিগুলোর কোনোটাতে আগুন ছিল। একটা বাজি হাতের মধ্যেই গেল ফেটে। আলির ডান হাতটা বেশ খানিকটা পুড়ে গিয়েছিল।

একদিন বিকেলে খেলার সময় পাড়ার মন্টুদা এসে বলল -যা তো বাবলু এক বান্ডিল বিড়ি নিয়ে আয়। খেলা ছেড়ে বাবলু বিড়ি আনতে ছুটল, পাছে মন্টুদা রাগ করে। একদিন মন্টুদা ওকে একটা বিড়ি খেতে বলল। তারপর থেকে বাবলু আর বিড়ি ছাড়তে পারেনি। এখন বাবলু রাতে ঘুমোতে পারে না। খুব শ্বাসকষ্ট হয় ওর। ডাক্তার বলেছেন বাবলুর ফুসফুস অকেজো হয়ে গেছে।

1. ওপরের দুটো গল্প পড়ে তোমাদের কেমন লাগল?
2. আলির ডান হাতটা পুড়ে গিয়েছিল। এর জন্য দায়ী কে?
3. আলির কী করা উচিত ছিল?
4. বাবলুর এহেন অবস্থার জন্য দায়ী কে?
5. বাবলুর কী করা উচিত ছিল?

'না' বলা

স্কুলে বাৎসরিক অনুষ্ঠানের দিন। খাওয়াদাওয়া শেষ করে সাবিনা, মিতা আর রতন বাড়ি ফিরছিল। মিতার আর রতনের বাড়ি আগে পড়ে। সাবিনাকে বেশ খানিকটা পথ হেঁটে আসতে হচ্ছিল। এমন সময় ভজাদার সঙ্গে দেখা। ওদের বাড়ির পাশেই থাকে। ভজাদা বলল সাবিনা, শহরে কাজ করবি? তোদের পরিবারের যা অবস্থা। শহরে বড়ো ডাক্তারের বাড়ি। পরিবারটা খুব ভালো। অনেক টাকা দেবে। সাবিনা বলল— দেখো ভজাদা, এখন আমার কাজ করতে ইচ্ছে করছে না। একটু পড়াশোনা করতে চাই। তাছাড়া মা অসুস্থ। মা চায় আমি পড়াশোনা করি। তাছাড়া আমি চলে গেলে কে আর ওদের কথা ভাববে বলোতো? তাই এখন নয়। একটু না হয় কষ্ট করেই চালিয়ে নেব।

অনেকসময় অনিচ্ছা ও অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও অনেক অনুরোধ বা আদেশ মেনে নিতে হয়। বন্ধু বা কাউকে 'না' বললে সম্পর্ক নষ্ট হবার ভয় থাকে। কিংবা পরে বন্ধুর বা কারোর থেকে সাহায্য না পাবার আশঙ্কাও থাকে। তবে এটা জানবে ঠিকমতো 'না' বলতে পারলে নানারকম বিপদ থেকেও নিজেকে রক্ষা করা যায়।

ওপরের গল্পটি পড়ো। তারপর বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে নীচের কাজটি করো ।

1. সাবিনা যদি 'হ্যাঁ' বলতো তাহলে কী হতো বলে মনে করো?
2. সাবিনা ভজাদাকে যেভাবে বলল তাতে কি ওর প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হয়ে গেল বলে মনে করো?
3. তুমি তোমার জীবনে কখনও 'না' বলে ভালো করেছ বলে মনে করো?
4. কখন 'না' বলা দরকার বলে মনে করো?

আবেগ নিয়ন্ত্রণ

বাংলা ভাষায় আবেগ ও অনুভূতি শব্দ দুটি প্রায় একইভাবে ব্যবহার করা হয়। ইংরাজিতে আবেগ হলো Emotion আর Feeling হলো অনুভূতি।

ভালো গান শুনলে আনন্দ হয়। নিজের নিন্দা শুনলে রাগ হয়, দুঃখ হয়। কারোর দুঃসংবাদে চোখে জল আসে। এসবই স্বাভাবিক। কিন্তু বেশি রাগ, দুঃখ কিংবা আনন্দের অনিয়ন্ত্রিত বহিঃপ্রকাশে শরীরের ও মনের ক্ষতি হতে পারে। আবেগের ওপর নিয়ন্ত্রণ রেখে চলা খুবই জরুরি। অনুভূতিগুলোকে বুঝে নিয়ে আবেগের যথার্থ প্রকাশের জন্য দরকার জীবনকুশলতা চর্চা।

যেমন রাগ হলো একধারে আবেগ আবার অনুভূতিও। আমরা যখন রেগে যাই তখন আমাদের শরীরে বিশেষ বিশেষ জৈব-রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। এর ফলে শরীরে তার ছাপ পড়ে।
আবার এই সময় আমাদের আচরণেরও পরিবর্তন ঘটে।
আচ্ছা বলো তো আমরা কি আমাদের আবেগ অনুভূতিগুলো চিনি? তাহলে আমরা রেগে যাই কেন? আবার অনেক সময় আবেগ অনুভূতিগুলো মনের ভিতর চেপে রাখি। প্রেসার কুকারে রান্নার সময় কুকারের মধ্যে বাষ্পের চাপ বাড়লে জোরে হুইসল বাজে আর সেই বাষ্প বেরিয়ে যায়। আমরা যদি সব অনুভূতিগুলোকে মনের ভেতর জমিয়ে রাখি, তাহলে তো ঘোর বিপদ। তাই না?

তাই আমাদের আবেগ অনুভূতিগুলোকে চেনা খুব জরুরি। প্রকাশ করতে শেখাও জরুরি। না হলে আমাদের অবস্থা হবে ঠিক প্রেসার কুকারের মতো।

বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে তোমাদের আবেগ/ অনুভূতির তালিকা তৈরি করো। তারপর সেগুলোকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে সে বিষয়ে দু-চার কথা লেখো :

আবেগ/ অনুভূতি			
1. রাগ	4. হতাশা	7. তৃপ্তি	10.
2. ভয়	5. ক্ষোভ	8. অভিমান	11.
3. কান্না	6. আনন্দ	9. দুঃখ	12.

অন্ধকারে একা থাকলে রমার বুক ধড়ফড় করে। হাত পায়ের পাতা ঘেমে যায়। হাত পা কাঁপে। পেশিতে টান ধরে, মাথা ব্যথা করে, পিঠে যন্ত্রণা হয়। গা গুলিয়ে ওঠে ।

গল্পটা পড়ো। বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে নীচের কাজটা করো।

1. এখানে রমার কোন কোন অনুভূতির প্রকাশ পেয়েছে?
2. এরকম পরিস্থিতিতে কী করা দরকার বলে মনে করো ?
3. গত একমাসে বিভিন্ন ঘটনায় তোমার কী কী অনুভূতি হয়েছিল তা লেখো।
4. তার মধ্যে কোন কোন অনুভূতিগুলো তুমি সহজে চিনতে পেরেছ বলে মনে করো?
5. তোমার কাছে কোন অনুভূতিগুলো বেশ কষ্টকর ?
6. তুমি অঙ্গভঙ্গি করে কোন কোন অনুভূতির প্রকাশ করতে পারো?

শারীরিক সমস্যা	অনুভূতি
1. বুক ধড়ফড়	ভয়
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

আত্ম-উপলব্ধি

নীচের লেখাটা মন দিয়ে পড়ো। তোমার কাছে কোন লাইনটা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ তার তলায় দাগ দাও।

আমি একজন ভালো মানুষ হবার জন্যই জন্ম নিয়েছি। আমি সবার থেকে আলাদা। আমি নিজেকে খুব ভালোবাসি। আমি তোমাদের সবাইকেও ভালোবাসি। আমার মধ্যে দক্ষতা আছে। বিশেষ গুণও আছে জীবনে কিছু করার। অন্যদের মতো আমিও জীবনে দারুণ কিছু করে উঠতে পারি।

আত্মসচেতনতার জন্য নীচের কাজটি করো। তবে কাজটি করার সময় নিজের প্রতি অবশ্যই যত্নবান হবে।

1. আমি আমার বাবা-মায়ের ভালো সন্তান কারণ_____
2. আমি একজন ভালো বন্ধু কারণ_____
3. আমি আমার ক্লাসে একজন ভালো ছাত্র/ছাত্রী কারণ_____
4. আমার বিশেষ গুণ হলো_____
5. আমার যে গুণটা সবাই পছন্দ করে সেটি হলো_____
6. যে গুণটা আমার পছন্দ সেটি হলো _____

বয়ঃসন্ধি ও জীবনকুশলতা শিক্ষা

শৈশব থেকে শুরু করে শেষ বয়স পর্যন্ত মানুষের বিকাশপর্বে বয়ঃসন্ধিকাল এক গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। এই পর্বের বিশেষত্বই হলো শরীর ও মনের দ্রুত পরিবর্তনশীলতা। দ্রুত বদলে যাওয়া পরিবেশের সঙ্গে তৈরি বয়ঃসন্ধিকালের টানাপোড়েনের মুখোমুখি হতে হয় সকলকেই। কোনো কোনো সময় আমরা দিশেহারা হয়ে যাই। তাই নিজের এবং বাইরের পরিবেশের নানা অনিশ্চয়তার ও চাপের মুখোমুখি হবার কুশলতা অর্জন করতে হবে নিজেকেই। তাই নিজেকে চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে যথার্থ ভালো মানুষ হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য দরকার জীবনকুশলতা শিক্ষা। জীবনকুশলতা অনেকরকমের হয়। তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পরিকল্পিত দশটি কেন্দ্রীয় (Generic) জীবনকুশলতা (Life skills) শিক্ষার নিয়মিত চর্চা জীবনের নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবার সাহস জোগায়। জীবনকুশলতা চর্চার বিভিন্ন দিকগুলি হলো —

> জীবনকুশলতা হলো এক বিশেষ আচরণ যা প্রতিটি মানুষকে তার নানা চাহিদা ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করে মোকাবিলা করার সাহস যোগায়।

1. আত্মসচেতনতা — নিজের ভালোলাগা, খারাপলাগা থেকে শুরু করে, আবেগ অনুভূতিগুলিকে চিনে তার নিয়ন্ত্রণে পারদর্শী হয়ে ওঠা।

2. বিশ্লেষণধর্মী চিন্তা — জীবনের নানা সমস্যার মুখোমুখি হয়ে চিন্তাভাবনা করে সমস্যার মোকাবিলা করা।

3. সিদ্ধান্ত নেওয়া — এলোমেলো চিন্তাগুলোকে সুবিন্যস্ত করে ঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো।

4. সমস্যা দূর করা — সমস্যাটাকে চেনা। তার সমাধানের নানা উপায়গুলোকে বিচার করা। তারপর কার্যকরী সমাধান বেছে নিয়ে প্রয়োগ করা।

5. সৃজনশীল চিন্তা — গান, নাচ, সাঁতার, ছবি আঁকা, খেলাধূলা সহ নানা সৃজনশীল কাজে অংশগ্রহণ করা।

6. পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন — অন্যের কথা ধৈর্য ধরে শোনার অভ্যাস তৈরি করা। কী বলব যেমন গুরুত্বপূর্ণ, কীভাবে বলব সেটাও অনুশীলন করা।

7. পারস্পরিক সম্পর্ক — পরিবারের, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু ও অন্যান্য মানুষজনের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি করা।

8. সমানুভূতি — অন্যের সমস্যার সঙ্গে নিজেকে শামিল করে তার অনুভূতিগুলোকে বোঝা ও প্রকাশ করা।

9. মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ — মনের ওপর তৈরি হওয়া চাপগুলোকে চিনে কীভাবে সেগুলোকে কমানো যায় তার অনুশীলন করা।

10. আবেগ নিয়ন্ত্রণ — নিজের বিভিন্ন অনুভূতিগুলো সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা এবং যথাযথভাবে তা প্রকাশ করা ।

বন

নীচের কোন শব্দটি উদ্ভিদসমষ্টিকে বোঝায়?

- সমুদ্র
- পাহাড়
- বন

বন হলো অনেকটা অঞ্চল জুড়ে জন্মানো উদ্ভিদসমষ্টি। পৃথিবীর স্থলভাগের এক-তৃতীয়াংশই বনে ঢাকা। ভারতের স্থলভাগের 21 শতাংশ স্থান হলো বন। কিন্তু পৃথিবীর বনভূমির পরিমাণ উদ্‌বেগজনক হারে কমতে শুরু করেছে। বন বাঁচানোর সচেতনতা বাড়ানোর জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ 2011 সালকে 'আন্তর্জাতিক বনবর্ষ' বলে ঘোষণা করেছিলেন।

এবার বন বিষয়ে নীচের সারণিটি পূরণ করো। প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

বন থেকে মানুষ কী কী উপকার পায়	কীভাবে বন ওই ভূমিকা পালন করে	আবহাওয়ার কোন কোন ভৌত উপাদানের ওপর বনের গঠন নির্ভর করে
1. আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ		• সূর্যালোক
2. পৃথিবীপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ও জলচক্র নিয়ন্ত্রণ		• তাপমাত্রা
3. বন্য জীবজন্তুর আশ্রয়স্থল		• বায়ুপ্রবাহ
4. মাটির ক্ষয় ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ		• বৃষ্টিপাত
5. আসবাবপত্র, বিভিন্ন শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠ উৎপাদন		• বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ
6. মাটির নীচের জলের স্তর নিয়ন্ত্রণ		
7. জ্বালানির উৎস		
8. বিভিন্ন মারণরোগের ওষুধের উৎস		
9.		

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে বনের বিভিন্ন গাছ থেকে ব্যবহৃত 5000 -এর বেশি জিনিস পাওয়া যায়। কোনো

বৃক্ষজাতীয় গাছ যদি প্রায় 50 বছর বেঁচে থাকে তবে সে তার জীবদ্দশায় 2700 কেজি অক্সিজেন বাতাসে ছাড়ে।

তুমি বিদ্যালয়ে, বাড়িতে বা খেলার মাঠে বা যাতায়াতের পথে যেসব জিনিস ব্যবহার করো বা করতে দেখো তার একটা তালিকা দেওয়া হলো। এদের নিয়ে নীচের সারণিটি পূরণ করো:

ব্যবহৃত জিনিসের নাম	ওই জিনিস তৈরিতে ব্যবহৃত বনের উপাদানের নাম	উৎস
1. পেনসিল 2. খেলার ব্যাট 3. ওষুধ 4. পোশাক 5. যানবাহন 6. মাদুর 7. ছাউনি 8. জ্বালানি		

আবহাওয়ার বিভিন্ন শর্তের পার্থক্যভেদে নানা জায়গায় নানা ধরনের বনের অস্তিত্ব দেখা যায়। এই ধরনের বনে কী কী উদ্ভিদ ও প্রাণী থাকে বা থাকতে পারে তার নাম নীচের খোপে লেখো।

- সুচের মতো পাতাযুক্ত গাছের বন (পাইন, ওক, কালো ভালুক, চিতাবাঘ .....)
- পাতা ঝরা গাছের বন (সেগুন, অর্জুন, আমলকী, বাঘ, হাতি, বাইসন.....)
- চিরসবুজ গাছের বন (জাম, বট, আম, বাঘ, হরিণ, ময়ূর.....)
- কাঁটাওয়ালা ঝোপঝাড় (বাবুল, ক্যাকটাস, কৃষ্ণসার হরিণ, চিংকারা, শেয়াল.....)
- ঘাসের বন (ঘাস, হোগলা, শন, পুরুণ্ডি, গন্ডার , হরিণ, জেব্রা.....)
- শ্বাসমূলযুক্ত গাছের বাদাবন (গরান, গেঁওয়া, বাইন, বাঘ, খাঁড়ির কুমির, ভোঁদড়.....)

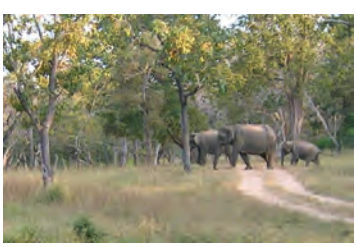
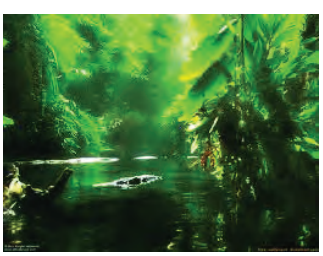

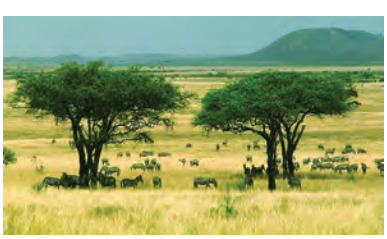

বনে যে সব প্রাণী বা উদ্ভিদ থাকে তাদের কয়েকটি ছবি ও নামের একটি তালিকা নীচে দেওয়া হলো।

গিরগিটি	শিরীষ	সাপ	আম	হনুমান	হরিণ
শেয়াল	কুসুম	পেঁচা	জাম	হাতি	মাছ
ময়ূর	মেহগনি	ভালুক	বট	বাঁশ	কাঁকড়া
ঈগল	ওক	কাঠবিড়ালি	আমলকী	চালতা	কচ্ছপ
পোকা	দেবদারু	চিতাবাঘ	গরান	গম্ভার	বাঘ
কেঁচো	পাইন	কাঠঠোকরা	ঘাস	পিঁপড়ে	বেজি
বাদুড়	মৌমাছি	উইপোকা	প্যাংগোলিন	সিংহ	ভোঁদড়

ওপরের জীবদের তালিকা থেকে ন্যূনতম তিনটি জীব নিয়ে একটি করে খাদ্যশৃঙ্খল তৈরি করো। খাদ্যশৃঙ্খলে কারা উৎপাদক, তৃণভোজী বা মাংসাশী তা উল্লেখ করো।

একটা আদর্শ বনের গঠন কেমন হতে পারে?

বড়ো বৃক্ষ জাতীয় গাছের বনে গেলে দেখা যায় যেসব ধরনের গাছের বৃদ্ধি একরকম নয় বা সব গাছের দৈর্ঘ্য সমান নয়। ফলে বনে নানা স্তরের সৃষ্টি হয় —

i) একদম ওপরের স্তরকে বলা হয় ছাদ (canopy)। গাছের মাথারা এক হয়ে এই স্তর গঠন করে। গাছের চূড়াগুলো এক হয়ে যে ছাদ গঠন করে তা সূর্যের আলোকে বনের গভীরে ঢুকতে বাধা দেয়। বর্ষাবনে এটি সাধারণত 30 মিটার-এর বেশি উচ্চতায় তৈরি হয়। কখনো-কখনো 90 মিটার উচ্চতায় পৌঁছোয়। এবার বলার চেষ্টা করো বনের এই স্তর কেন সবচেয়ে বেশি খাদ্য তৈরি করে।

ii) ছাদের নীচের স্তরে দেখা যায় এমন গাছ যারা ক্রমশ লম্বা হয়ে ক্যানোপি স্পর্শ করার চেষ্টা করে। তাই এই স্তরের গাছগুলো লম্বায় অপেক্ষাকৃত ছোটো হয়। এই স্তরে বাতাসের বেগ তুলনামূলকভাবে কম এবং আলো কম ; এখানে কম উচ্চতার বৃক্ষ, গুল্ম এবং নরম কাণ্ডের বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ বেশি দেখা যায়। বেশি বয়স্ক গাছ বা চারাগাছের গুল্ম আধিক্য চোখে পড়ে।

iii) তৃতীয় স্তরে নতুন জন্মানো গাছ, পরিণত গুল্ম এবং নানাধরনের ঝোপওয়ালা গাছ দেখা যায়। বনের ছোটো ছোটো প্রাণীদের খাদ্য, বাসস্থান ও আত্মরক্ষার জন্য এই স্তর ব্যবহৃত হয়।

iv) বনের মেঝের ঠিক ওপরে অল্প উচ্চতার যে ধরনের গাছ থাকে তারা মূলত বীরুৎজাতীয়, এখানে বীজ থেকে বেরোনো সদ্যোজাত গাছের চারা, ফার্ন, ঘাস এবং নানা আগাছা দেখা যায়। এরা বনের মেঝেকে ঢেকে রাখে। ইঁদুর, পোকামাকড়, সাপ, কচ্ছপ, ব্যাং ও নানা পাখি এই স্তরে বাস করে। হরিণরা তাদের বাচ্চাদের আর শিকারি প্রাণীরা শিকার ধরার জন্য নিজেদের এই স্তরে লুকিয়ে রাখে। বনের এই স্তরে সবসময়ই কোনো না কোনো ঘটনা ঘটে চলে।

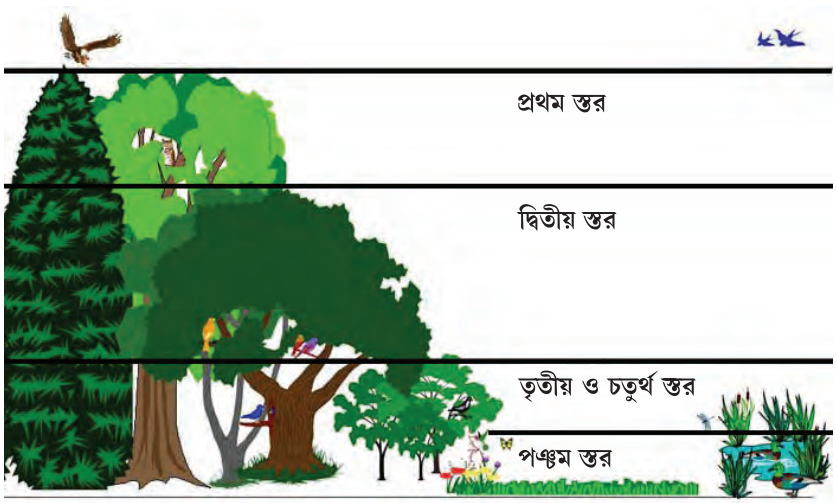

v) বনের গঠনের শেষস্তর হলো বনের মেঝে। এটি সাধারণত মরা পাতা, পড়ে থাকা ফুলের পাপড়ি, পচা ফল, গাছের ছোটো ডাল, পাখির পালক, প্রাণীর লোম ও মল, পচাগলা বা মরে যাওয়া জীব দেহের নানা পদার্থ দিয়ে তৈরি হয়। মাটির সাথে মিশে এই সব পদার্থ হিউমাস তৈরি করে। এই ধরনের পদার্থ থেকে বনের গাছের বৃদ্ধি সহায়ক নানা উপাদান খনিজ মৌল, অ্যামিনো অ্যাসিড বের হয়। কেঁচো, আরশোলা, কাঁকড়াবিছে, তেঁতুলবিছে, শামুকসহ নানা আণুবীক্ষণিক জীব এখানে বাস করে।

পৃথিবীতে কোথায় কেমন ধরনের বন দেখা যায়?

সারা পৃথিবীর সব জায়গায় বনের পরিমাণ কিন্তু সমান নয়। সারা পৃথিবীর স্থলভাগের এক-তৃতীয়াংশ বনে ঢাকা। এর 95% প্রাকৃতিকভাবে গড়ে ওঠা। আর বাকি 5% মানুষের তৈরি। এর মধ্যে দক্ষিণ আমেরিকায় বনের পরিমাণ প্রায় 23% আর ওশিয়ানিয়ায় মাত্র 5%। তোমরা শুনলে হয়তো অবাক হবে যে পৃথিবীর দশটা দেশে কোনো বন নেই। আর অন্যান্য 64টি দেশে বনের পরিমাণ সে দেশগুলোর স্থলভাগের দশ শতাংশেরও কম।

টুকরো কথা

তোমরা তো আমাজনের বর্ষাবনের কথা জেনেছ। লম্বা লম্বা গাছ, উষ্ণ আবহাওয়া আর প্রচুর বৃষ্টি এ ধরনের বনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। নিরক্ষরেখা বরাবর (ওপরে ও নীচে 10^0-এর মধ্যে) এধরনের বন দেখা যায়। এই বনে গাছগুলো এত ঘন হয়ে জন্মায় যে বনের মাথায় আসা বৃষ্টির প্রথম ফোঁটা মাটিতে আসতে প্রায় 10 মিনিট সময় লাগে। এক হেক্টর এরকম বর্ষাবনে প্রায় 40-এর বেশি প্রজাতির গাছ থাকে। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত জানা 2,50,000 উদ্ভিদ প্রজাতির মধ্যে প্রায় 1,70,000 প্রজাতির গাছ এই বর্ষাবনগুলিতে পাওয়া যায়। এই বর্ষাবনে আফ্রিকান হাতির মতো বড়ো স্তন্যপায়ী থেকে মাউস-লেমুরের মতো ছোটো স্তন্যপায়ীর দেখা মেলে। অ্যাকোয়ারিয়ামে যে রঙিন মাছদের তুমি দেখো তাদের অধিকাংশই দক্ষিণ আমেরিকা বা এশিয়ার বর্ষাবনের জলে জন্মায়। পেরুর বর্ষাবনের একটা গাছেই 50 টা প্রজাতির পিঁপড়ের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই বর্ষাবন থেকেই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের অধিকাংশ অক্সিজেনের উৎপত্তি। বাতাসে যে জলীয় বাষ্প মুক্ত করে তাই আবার বৃষ্টি হয়ে ফিরে আসে। আবহাওয়া ঠিক রাখতে এর জুড়ি মেলা ভার। বর্ষাবন হলো স্পঞ্জের মতো। জলীয় বাষ্প শুষে নিয়ে ধীরে ধীরে ছাড়তে থাকে। ফলে নদীতে জলপ্রবাহ কখনই এমন হয় না যাতে বন্যার সম্ভাবনা দেখা দেয়। আর এই বর্ষাবনেই সন্ধান মেলে জীবন বাঁচানো নানা ওষুধের। তাপির, গরিলা, শিম্পাঞ্জি, ওকাপি, ওরাংওটাং, সুমাত্রার গন্ডার বা বাঘের মতো বিলুপ্তপ্রায় জীবজন্তুরা এই বর্ষাবনেই বেঁচে আছে। কিন্তু একেই আমরা ক্রমাগত ধ্বংস করে চলেছি। প্রতি সেকেন্ডে প্রায় দেড় একর বর্ষাবন কাটা পড়ে। এরকম হারে বনধ্বংস চলতে থাকলে আগামী 100 বছরের মধ্যে পৃথিবী থেকে প্রায় সব বর্ষাবন হারিয়ে যাবে।

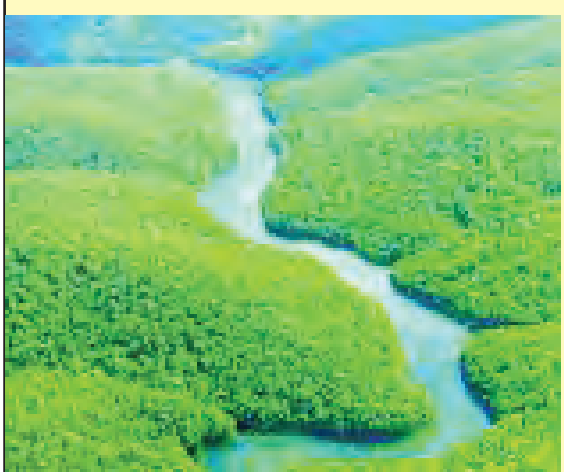

বনের আগুন ও পরিবেশের ক্ষতি

বনে আগুন লাগার ঘটনা ঘটলে তা সাধারণত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। অধিকাংশ সময় প্রথমে আগুন লাগলে তা মানুষের নজরে আসে না। নানা কারণে বনে আগুন লাগে—

1.অগ্ন্যুৎপাতের সময় বনের গাছের কোনো শুকনো গাছের জ্বলন্ত লাভার সংস্পর্শে আসা।

2. বজ্রপাত।

3. বায়ুপ্রবাহ তীব্র হলে পাশাপাশি দুলতে থাকা বাঁশগাছে ঘষা লাগা ।

4.গড়িয়ে পড়া পাথরের ধাক্কায় তৈরি হওয়া আগুনের শিখার সংস্পর্শে বনের মেঝেতে পড়ে থাকা শুকনো পাতা এলে।

5. মানুষের নানাবিধ কাজ — বনের ভিতর ধূমপান, রান্না করা ইত্যাদি ।

বনে আগুন লাগলে কী কী ক্ষতি হয়

1. বন ছাড়া মানুষের বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। আগুন লেগে বন নষ্ট হলে বাতাসে CO_2-এর ঘনত্ব বাড়তে থাকে আর O_2-এর ঘনত্ব কমতে থাকে। ফলে পরিবেশের তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়তে থাকে।
2. বনের মাটি আর গাছের পাতা বৃষ্টিপাতের প্রায় 50% শুষে নেয়। বনে আগুন লাগার পর মাটি ও গাছের পাতার সেই ক্ষমতা আর থাকে না। ফলে বন্যার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।
3. বড়ো গাছগুলো পুড়ে যাওয়ার ফলে প্রবল বৃষ্টিপাতের সময় মাটির ক্ষয় বেড়ে যায়। দাবানলের পর প্রথম বৃষ্টিপাতের সময় জলে ছাই মিলে যাওয়ায় জলদূষণ হতে পাড়ে।
4. বনে আগুন লাগলে বহু প্রাণীর তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। আর বাকিরা আশ্রয় হারিয়ে ফেলে। কোন ধরনের প্রাণীদের ক্ষেত্রে এধরনের ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি থাকে?

টুকরো কথা

1910 সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এক বিধ্বংসী দাবানলের ফলে প্রায় তিন মিলিয়ন একর বন নষ্ট হয়। দাবানলটি প্রায় দু-দিন স্থায়ী হয়েছিল। এই দাবানল নেভানোর কাজে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তার মধ্যে 87 জন এই দাবানলে মারা যান। অতি সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়াতেও এরকম দাবানলের ঘটনায় প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। পৃথিবীজুড়ে ঘটে চলা এরকম বনধ্বংসের ঘটনাগুলি জানার চেষ্টা করো এবং পরিবেশের ওপর তার কী প্রভাব পড়ছে তা নিয়ে নিজেরা আলোচনা করে একটি রিপোর্ট তৈরি করো।

বন কেটে ফেলা ও পরিবেশের ক্ষতি

মানুষ তার নানা প্রয়োজনে, (জমির অত্যধিক চাহিদা, গৃহনির্মাণ ইত্যাদি) কোনো জমিতে দীর্ঘদিন ধরে বেড়ে ওঠা গাছপালার অপসারণ বা কেটেই চলেছে। সারা পৃথিবীতে প্রতি সেকেন্ডে মানুষ প্রায় $1\frac{1}{2}$ একর বন কেটে

ধ্বংস করে। এবার দেখা যাক এর ফলে কী কী সমস্যা হতে পারে —

1. মাটির খুব গভীরে বা কম গভীরে যাওয়া গাছ যদি হঠাৎ উপড়ে ফেলা হয়, তবে যে মাটির কণাগুলোকে গাছের মূল আঁকড়ে ধরে থাকে, তারা আলাদা হয়ে যায়। তারপর জল শুকিয়ে গেলে ওই মাটি ঝুরঝুরে হয়। বৃষ্টির ধারায় সেই মাটি সহজে ধুয়ে চলে যায় এবং নিচের পাথর বেরিয়ে যায়। ফলে সেখানে তখন আর কোনো উদ্ভিদ জন্মাতে পারে না। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এই ধরনের ঘটনা দীর্ঘদিন ধরে ঘটতে থাকলে মরুভূমি পর্যন্ত সৃষ্টি হতে পারে (Desertification)।
2. বন কেটে ফেললে ওই অঞ্চলের মাটি আর বৃষ্টির জল ধরে রাখতে পারে না। ফলে মাটির নীচের জলের স্তর কমতে থাকে।
3. বন ক্রমাগত কাটতে থাকলে CO_2 শোষণে বেশি সক্ষম গাছের সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে। বাতাসে CO_2-এর পরিমাণ বেড়ে গেলে পরিবেশ গরম হয়ে যায় (Global warming)। অতিরিক্ত গরমে জলচক্র (জল → মেঘ → বৃষ্টি → বরফ) ব্যাহত হয়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমতে থাকে বা বৃষ্টিপাতের ধরনের পরিবর্তন ঘটে। ফলে খরার (Drought) ও বন্যার (Flood) সম্ভাবনা বাড়ে।
4. বিভিন্ন প্রাণী বিশেষ ধরনের গাছ বা বনাঞ্চলকে তার বাসস্থানের জন্য ব্যবহার করে। এধরনের বনাঞ্চল ধ্বংস হলে ওই প্রজাতির বিলুপ্তির (Extinction) সম্ভাবনা বাড়ে এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস পায়।

বন কেটে ফেলা ও পরিবেশের ক্ষতিসংক্রান্ত নীচের ছবিগুলো বিশ্লেষণ করো।

কী করে বন বাঁচানো সম্ভব

1. বনাঞ্চলে গাছকাটা বন্ধ করা।
2. গাছ পোঁতা ও নতুন নতুন বনাঞ্চল তৈরি করা।
3. বনে আগুন লাগার সম্ভাবনা কমানো ও বনাঞ্চলে পশুচারণ নিয়ন্ত্রণ করা।

4.বনের পরিণত গাছ কাটা এবং সেই জায়গায় ওই একই প্রজাতির নতুন গাছের চারা লাগানো।

5.বনের গাছে কোনো রোগের আক্রমণ ঘটলে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

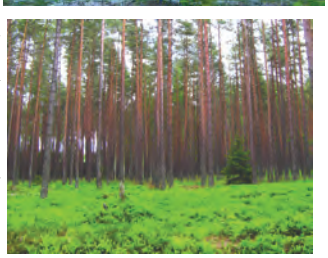

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান দুটি বনভূমি হলো উত্তরবঙ্গের বনভূমি এবং সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভস উদ্ভিদের বনভূমি। উত্তরবঙ্গে উঁচু পাহাড়ি অঞ্চলের (8,000 ফুটের ওপরে) ও ডুয়ার্স এবং তেরাই-র বন দেখা যায়। বর্তমানে পরিবেশের নানান পরিবর্তন ও মানুষের নানাবিধ কার্যাবলির ফলে ওই বনগুলিতে কিছু সংকট তৈরি হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের বনভূমির সংকট

উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স এবং তরাই-এ বনভূমিতে শাল, গামার, ওদাল, খয়ের, শিশু, আমলকী এবং উঁচু পাহাড়ের ঢালে রোডোডেনড্রন, পাইন প্রভৃতি নানা গাছ চোখে পড়ে। আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে বিদেশ থেকে ধূপী গাছের চারা এনে উঁচু পাহাড়ের ঢালে ধূপীর বন তৈরি করা হয়েছে। ডুয়ার্স এবং তরাইতেও এরকম অনেক জায়গাতে মানুষের তৈরি শাল বা সেগুনের বন আছে। মানুষের তৈরি এইসব বন প্রাকৃতিক বনাঞ্চল কেটেই তৈরি হয়েছে। চা-বাগানের জন্যও প্রাকৃতিক বনাঞ্চলের অনেকটাই সংকুচিত।

উত্তরবঙ্গের বনভূমি সংলগ্ন চা-বাগানে কিংবা অনেক সময় বনভূমির পার্শ্ববর্তী জনবসতি এলাকায় ঘুরলে প্রায়ই চিতাবাঘ হানার কথা শোনা যায়। প্রাকৃতিক খাদ্যের অভাবে চিতাবাঘের খাদ্যাভ্যাস অনেকটাই বদলে গেছে। এদের প্রাকৃতিক খাদ্য হলো নানা ধরনের তৃণভোজী প্রাণী — ছোটো হরিণ, বুনো ছাগল, খরগোশ, বুনো মোরগ, ময়ূর। আর খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তনের পর এরা জঙ্গলের ধারে গ্রামের সীমানা থেকে প্রায়ই ছাগল, গোরু-মোষের বাচ্চা, হাঁস-মুরগি, কুকুর ধরতেই বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এর সামগ্রিক পরিণতি হলো চিতাবাঘ-মানুষের সংঘাত। চা পাতা তুলতে গিয়ে ঝোপেঝাড়ে থাকা চিতাবাঘের আক্রমণের মুখোমুখি হচ্ছে চা শ্রমিকরা। অনেক সময় বিষ প্রয়োগে বা মরণফাঁদ তৈরি করে চিতাবাঘদের মেরে ফেলা হচ্ছে।

গন্ডারের বসবাস উপযোগী জঙ্গল ও জলার তৃণভূমি আয়তনে ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসতে থাকায় ও মানুষের বসতি বেড়ে উঠতে থাকায় উত্তরবঙ্গের বনভূমিতে থাকা একশৃঙ্গ গন্ডারের অস্তিত্বও বিপন্ন হয়ে উঠেছে।

বন কেটে হাতির যাতায়াতের পথে রেললাইন বসানোয় ও জনবসতি গড়ে ওঠায় উত্তরবঙ্গের বনভূমির আরেক সংকট হলো মানুষ-হাতি সংঘাত। উত্তরবঙ্গে ইদানীং ট্রেনে কাটা পড়ে অনেক হাতি মারা যাচ্ছে। বর্ষার শুরুতে ভুট্টা ফলার সময় আর শীতের শুরুতে ধান পাকতে শুরু করলে হাতির চলাচল অনেকটা বেড়ে যায়। হাতির দল তখন নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে মানুষের সঙ্গে হাতির সংঘাত শুরু হয়ে যায়।

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম দিকে যে শাল, সেগুনের অরণ্য দেখা যায় সেখানেও প্রায়ই দলমা পাহাড় থেকে হাতিরা নেমে আসে। তার জঙ্গলে ফিরে না গিয়ে জনবসতি এলাকায় দীর্ঘ সময় থাকার ফলে একই সমস্যা দেখা যাচ্ছে।